Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শারমিন আকতার

রোলঃ 228020524

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শারমিন আকতার

রোলঃ 228020524

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শারমিন আকতার, আইডিঃ 228020524 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

শারমিন আকতার

(স্বাক্ষর)

শারমিন আকতার

আইডিঃ 228020524

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকাঃ 5
আকিকার কিছু উপকারিতাঃ 10
সুন্দর নাম রাখা : 11
নাম রাখার ক্ষেত্রে কিছু লক্ষণীয় বিষয়- 12
সন্তানকে দুধ খাওয়ানোঃ 13
সুন্নাতে খতনার স্বাস্থ্যগত উপকারিতা 15
সন্তানের অধিকারঃ 16
(ক) গর্ভকালীন অধিকার সমূহ : 19
(খ) জন্ম পরবর্তী অধিকার : 21
পিতৃহারা সন্তানের প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ : 24
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনে অভ্যস্ত করা : 25
সৌজন্যবোধ শিক্ষা দান : 26
ব্যবহারিক শিক্ষা দান : 27
তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া : 27
(খ) পৃথিবীতে আগমনের পরবর্তী অধিকার সমূহ : 30
সন্তানের শিক্ষা দীক্ষাঃ 30
সন্তানকে শিষ্টাচারের শিক্ষা প্রদানঃ 36
কন্যা সন্তান প্রতিপালনের তিনটি ফজিলত: 44
কন্যা সন্তানের হকসমূহ: 45
সন্তান চারিত্রিক হওয়া নির্ভর করে পরিবারের সচেতনতার উপর: 47
সন্তান চারিত্রিক হতে হলে বাবা-মা সচেতন হতে হবে: 49
ভাগ্যবানদের আল্লাহ উপহার দেন কন্যা সন্তান: 52
সন্তান লালন পালনের ফজিলত: 53

কন্যা সন্তান জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়: 54
কন্যা সন্তান প্রতিপালনের তিনটি ফজিলত: 54
কন্যা সন্তানের জন্মে অধিক আনন্দ প্রকাশ করা: 55
কন্যা সন্তানের হকসমূহ: 55
সন্তান লালন পালনের পদ্ধতি: 56
রাগান্বিত অবস্থায় প্রহার না করা: 57
শিশুর ত্রুটি ছোট থেকেই সংশোধন করতে হবে: 57
গর্ভবতী মায়ের কর্মের প্রভাব: 58
কান্না থামানোর জন্য মিথ্যা না বলা: 59
মা-বাবার প্রথম কর্তব্য: 60
ছোট থেকেই বিনয় শেখাতে হবে: 60
শিশুকে ভালো কাজে উৎসাহ দেওয়া: 62

ভূমিকাঃ

সন্তান মহান আল্লাহর সর্ব শ্রেষ্ঠ নেয়ামত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পৃথিবীতে যত নেয়ামত দান করেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে দামি নেয়ামত সন্তান। সন্তান দুনিয়াতে আসার মাধ্যম হলো বাবা-মা। বাবা-মার খেদমত, ও সম্মান সন্তানের যেমন কর্তব্য তেমনি মাতা-পিতারও সন্তানের হকসমূহ আদায় করা কর্তব্য।

১) সন্তান কি?.......

আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি কণা আল্লাহর দান। জীবনের প্রতিটি বিন্দু আল্লাহর দয়া। তাই আমাদের অস্তিত্ব ও জীবন আল্লাহর কাছে ঋণী। আমাদের উপর আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামতরাজির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি নিয়ামত হল আমাদের সন্তানেরা।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَ اللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَ حَفَدَةً وَّ رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَ بِنِعْمَتِ اللهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ.

আল্লাহ তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের স্ত্রীদের থেকে তোমাদের জন্য পুত্র ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন। আর ভালো-ভালো জিনিসের থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। তবুও কি তারা ভিত্তিহীন জিনিসের প্রতি ঈমান রাখবে আর আল্লাহর নিআমতসমূহের অকৃতজ্ঞতা করবে? [সূরা নাহল (১৬) : ৭২]

সন্তান আল্লাহর দান। আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় এক আমানত। আল্লাহ এর মাধ্যমে পরীক্ষা করেন, বান্দা এই আমানতের যথাযথ হেফাযত করে কি না। সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে দুইভাবে পরীক্ষা করেন।

এক. সন্তানের কারণে বান্দা আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করে কি না।

দুই. বান্দা সন্তানকে আমানত মনে করে কি না এবং সে আমানতের হেফাযতে যত্নবান হয় কি না। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، وَّ اَنَّ اللهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ.

জেনে রেখ, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা। আর মহা পুরস্কার রয়েছে আল্লাহরই কাছে।

সূরা আনফাল (৮) : ২৮

২) গর্ভাবস্থায় সন্তানের জন্য করনীয়ঃ

গর্ভে সন্তান আশা নারীর জন্য সম্মান ও সৌভাগ্যের। গর্ভাবস্থায় মায়ের কর্তব্য অনাগত সন্তানের জন্য কল্যাণের দোয়া করা।

বাচ্চার সুস্থতা ও নেক হওয়ার জন্য এ দোয়াটি পড়তে পারেন –

"رَبِّ هَبۡ لِیۡ مِنۡ لَّدُنۡكَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِیۡعُ الدُّعَآءِ ﴿۳۸﴾هنالك دعا زكريا ربهٗ قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعآء"

অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা আপনার পক্ষ থেকে আমাকে পুত পবিত্র সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী (সূরা আল ইমরান, ৩৮)

মহান আল্লাহর কাছ থেকে সুসন্তান পাওয়ার জন্য গর্ভাবস্থায় নিম্নোক্ত কাজগুলো করার চেষ্টা করুনঃ

- গোনাহ থেকে বিরত থাকুন
- ধৈর্য্য ধারণ করুন
- সময় মত নামাজ আদায় করুন
- জিকির করুন
- শোকর আদায় করুন
- বেশি রাত পর্যন্ত জাগ্রত থাকা থেকে বিরত থাকুন
- অজু অবস্থায় থাকার চেষ্টা করুন
- আপনার সন্তানের জন্য কোরআন তেলাওয়াত করুন
- দোয়ার অভ্যাস করুন

৩) সন্তান, লালন-পালন.....

সন্তান জন্ম হওয়া মানুষের জন্য জীবনের সবচেয়ে আনন্দের একটি মুহূর্ত। একটি সন্তানই মা-বাবার জীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্য তার ওপর সন্তানকে সঠিকভাবে মানুষ করতে পারা সুন্দরভাবে লালন পালন করতে পারা আরো

বেশি সৌভাগ্যের। সন্তানের প্রতি বাবা-মায়ের দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন এবং দীর্ঘমেয়াদি। মাতৃগর্ভে সন্তানের বৃদ্ধি শুরুর সময় হতে বড় হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তার দায়িত্ব অব্যাহত থাকে। সুসন্তান পার্থিব জীবনে সুখ-শান্তি এবং পরকালে মুক্তির অন্যতম মাধ্যম। জনৈক ব্যক্তিকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদার আসীন করা হলে সে অবাক হয়ে বলবে, এমন মর্যাদা কোন আমলের বিনিময়ে পেলাম? আমি তো এত সৎ আমল করিনি। বলা হবে, তোমার জন্য তোমার সন্তানের প্রার্থনার কারণেই তোমাকে এ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ইবনে মাজাহ : ৩৬৬০

সন্তান আল্লাহতায়ালার বিশেষ নেয়ামত। বৃদ্ধকালে সন্তানই হয় মা-বাবার আল্লাহ ছাড়া একমাত্র ভরসা। সন্তানের প্রতি মা-বাবার রয়েছে অসংখ্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। সন্তানকে আদর্শ মুসলিম ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে তার হক সমূহ যথাযথভাবে আদায় করতে হবে

৪) সন্তান জন্মলাভের পর বাবা মায়ের প্রাথমিক দায়িত্ব

সুন্নতের ওপর চলতে পারা প্রতিটি মুসলমানের জন্য সৌভাগ্যের। রাসুলুল্লাহ সা.-এর আদর্শই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। প্রিয়নবী সা. জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের জন্য দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

প্রত্যেক মুসলিম অভিভাবকের উচিত সন্তান জন্মের পর ইসলামী নির্দেশনা অনুসরণ করা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে নবজাতককে স্বাগত জানিয়েছেন নিজের সন্তানের ক্ষেত্রেও তা পালন করা। তবেই আল্লাহ তায়ালার দেওয়া শ্রেষ্ঠ নেয়ামতের (সন্তান) যথাযথ শুকরিয়া আদায় করা হবে।

নবীজী (সঃ) এর নির্দেশনা মোতাবেক সন্তান জন্মলাভের পর করনীয়ঃ

আজান দেওয়া : সন্তান জন্মের পর ডান কানে আজান এবং বাঁ কানে ইকামত দেওয়া সুন্নত।

জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সন্তান-সন্তুতির কানে আজান ও ইকামত দেওয়ার অন্যতম কারণ হলো, আজান-ইকামতের মাধ্যমে নবজাতকের কানে মহান আল্লাহর পবিত্র নাম, তাওহিদ ও রেসালাতের ঘোষণা পৌঁছে দেওয়া হয়। ফলে

নবজাতকের হৃদয় ও মস্তিষ্কে ঈমানের আওয়াজ পৌঁছে। আর শয়তানের আক্রমণ থেকেও নিরাপদ থাকে নবজাতক।

হোসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে যার সন্তান হয়, সে যেন ডান কানে আজান এবং বাঁ কানে ইকামত দেয়। ’ (শুআবুল ইমান, হাদিস : ৮৬১৯)

এ ছাড়া মহানবী (সা.) হজরত হাসান (রা.)-এর কানে আজান দিয়েছেন বলে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

তাহনিক করানো : শিশুর জন্মগ্রহণের পর তাহনিক করা সুন্নত। তাহনিক অর্থ হলো, খেজুর চিবিয়ে নরম করে নবজাতকের মুখে দেওয়া। খেজুর না থাকলে মধু কিংবা মিষ্টিজাতীয় বস্তু দ্বারাও তাহনিক করানো যায়।

প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে নবজাতক শিশুকে নেওয়া হলে তিনি তাকে তাহনিক করতেন এবং তার জন্য বরকতের দোয়া করতেন আবু মুসা আশআরি (রা.) বলেন, ‘আমার একটি ছেলে জন্ম হয়। আমি তাকে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর কাছে নিয়ে আসি। তিনি তার নাম রাখেন ইবরাহিম এবং তাকে খেজুর দিয়ে তাহনিক করান। ’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৫৭৩৯)

অন্য হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে মক্কায় গর্ভে ধারণ করেন। তিনি বলেন, গর্ভকাল পূর্ণ হওয়া অবস্থায় আমি বেরিয়ে মদিনায় এলাম এবং কুবায় অবতরণ করলাম। কুবাতেই আমি তাকে প্রসব করি। তারপর তাকে নিয়ে রাসুল (সা.)-এর কাছে এসে তাকে তাঁর কোলে রাখলাম। তিনি একটি খেজুর আনতে বলেন। তা চিবিয়ে তিনি তার মুখে দিলেন। রাসুল (সা.)-এর এই লালাই সর্বপ্রথম তার পেটে প্রবেশ করেছিল। তারপর তিনি খেজুর চিবিয়ে তাহনিক করলেন এবং তার জন্য বরকতের দোয়া করলেন। (হিজরতের পরে) ইসলামে জন্মলাভকারী সেই ছিল প্রথম সন্তান। তাই তার জন্য মুসলিমরা মহা আনন্দে আনন্দিত হয়েছিলেন। কারণ তাদের বলা হতো ইহুদিরা তোমাদের জাদু করেছে, তাই তোমাদের সন্তান হয় না। (বুখারি, হাদিস : ৫৪৬৯)

গণমাধ্যম ও বিভিন্ন গবেষণাপত্র থেকে জানা যায়, চিকিৎসাবিজ্ঞানে নবজাতককে বিভিন্ন রোগব্যাধি থেকে বাঁচানোর জন্য 'সুগার জেল' ব্যবহারের নিয়ম রয়েছে, যা নবীজি (সা.)-এর এই সুন্নতের সঙ্গে মিলে যায়। ২০২১ সালে ইউনিভার্সিটি অব অকল্যান্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়, হাইপোগ্লাইসেমিয়ার ঝুঁকিতে থাকা নবজাতক শিশুদের মুখের ভেতরে চিনির জেল (মিষ্টান্ন) ঘষলে তাদের এই রোগ হওয়ার আশঙ্কা কমে যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে কোনো সুন্নতের পক্ষে গবেষণা থাকুক বা না থাকুক, মহান আল্লাহ যেহেতু রাসুলের সুন্নতকে আঁকড়ে ধরার আদেশ করেছেন, তাই প্রতিটি মুসলমানের উচিত রাসুল (সা.)-এর সুন্নতকে গুরুত্ব দেওয়া। মহান আল্লাহ সবাইকে তাওফিক দান করুন।

আকিকা করা : আকিকা আরবি শব্দ। এর অর্থ কর্তন করা। ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় নবজাতক ছেলে মেয়ের জন্মের সপ্তম দিন পশুর যে রক্ত প্রবাহিত করা হয় একে আকিকা বলে।

নবজাতকের জন্ম আল্লাহর বড় একটি নেয়ামত। আকিকার মাধ্যমে এই নেয়ামতের বহির্প্রকাশ হয়। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'সম্পদ ও সন্তানসন্তুতি জীবনের শোভা।' (সূরা কাহাফ, আয়াত : ৪৬)

সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে আকিকা করা মুস্তাহাব। ছেলেসন্তানের পক্ষ থেকে দুটি এবং মেয়েসন্তানের পক্ষ থেকে একটি বকরি আকিকা করতে হয়। আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, 'ছেলের জন্য দুটি সমবয়সী ছাগল এবং মেয়ের জন্য একটি ছাগল আকিকা করতে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদের আদেশ করেছেন। ' (জামে তিরমিজি, হাদিস : ১৫১৯)

হজরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন, 'ইহুদিরা পুত্রসন্তানের আকিকা করত কিন্তু কন্যাসন্তানের আকিকা করত না। তোমরা পুত্রসন্তানের জন্য দুটি ছাগল এবং কন্যাসন্তানের জন্য একটি ছাগল দিয়ে হলেও আকিকা করো।' (বায়হাকি, সুনানে কুবরা, হাদিস : ১৯৭৬০)

তবে কারো সামর্থ না থাকলে একটা ছাগল দিয়েও আকিকা হতে পারে। হজরত আলী (রা.) বলেন, ‘রাসূল (সা.) একটি ছাগল দিয়ে হাসানের আকিকা দিলেন।’ (জামে তিরমিজি, হাদিস : ১৬০২)

আকিকার কিছু উপকারিতাঃ

(ক) আকিকা একটি ইবাদাত। এর দ্বারা বাচ্চা দুনিয়াতে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর ইবাদত করার সৌভাগ্য অর্জন করে।
(খ) এর ফলে বাচ্চা বন্ধক মুক্ত হয় ও মাতা-পিতার জন্য সুপারিশ করার উপযুক্ত হয়।
(গ) আকিকার মাধ্যমে দানশীলতার বিকাশ ঘটে। গরিব মিসকিন ও আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় হয়। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সম্পর্ক বাড়ে। পরষ্পরে হৃদ্যতা ও আন্তরিকতাপূর্ণ ভালোবাসা সৃষ্টি হয়।
(ঘ) এটা জানের সদকা। এর মাধ্যমে বাচ্চা তার জানের সদকা পেশ করে। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা ইসমাঈলের পক্ষে বকরি ফিদইয়া হিসেবে পেশ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَفَدَيۡنَٰهُ بِذِبۡحٍ عَظِيمٖ ١٠٧﴾ [الصافات: ١٠٧]

“আর আমরা এক মহান যবেহের (একটি জান্নাতী দুম্বার) বিনিময়ে তাকে (ইসমাঈলকে) মুক্ত করলাম।” [সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ১০৭]

মাথা মুণ্ডন করা : বাচ্চা জন্মের সপ্তম দিনে মাথা মুণ্ডন করা ও চুলের সমপরিমাণ স্বর্ণ বা রুপা সদকা করা মুস্তাহাব। আলী (রা.) বলেন, ‘একটি বকরি দ্বারা রসূলুল্লাহ (সা.) হাসান (রা.)-এর আকিকা করেন এবং বলেন, হে ফাতিমা! তার মাথা মুণ্ডন করে দাও এবং তার চুলের সমপরিমাণ ওজনের রুপা দান করে দাও। ’ (জামে তিরমিজি, হাদিস : ১৫১৯)

সুন্দর নাম রাখা :

সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের জন্য, বিশেষভাবে ঈমানদার মুমিনের ক্ষেত্রে নামের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী। আর তা এজন্য যে, সকল শুভ কাজের সূচনা তাকে তার মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর 'নাম' উচ্চারণ করে তথা 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করতে হয়।

মহান আল্লাহর কাছে নামের গুরুত্ব এত বেশী যে, সর্বপ্রথম আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে তিনি সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দেন *(বাক্বারাহ ২/৩১)*। অতঃপর ফেরেশতাদের সামনে সমস্ত জিনিসের নাম বলে দিতে সক্ষম হওয়ায় আদমের শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদা নির্ধারিত হয়।

সন্তানের ভালো নাম রাখা অতি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা বিচার দিবসে মানুষকে নিজের নাম ও বাবার নাম ধরে ডাকা হবে। নাম যদি খারাপ হয়, তাহলে সেদিন সে হাশরবাসীর সামনে লজ্জিত হবে। হজরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'কিয়ামত দিবসে তোমাদেরকে তোমাদের পিতাদের নাম ধরে ডাকা হবে। তাই তোমরা তোমাদের সুন্দর নামকরণ করো।' (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৪৯৪৮)

মহান আল্লাহ তাঁর নিজ নামকে এতই ভালবাসেন যে, তিনি বলেন, আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, সে নামে তাঁকে ডাকো' *(আ'রাফ ৭/১৮০)*।

ক্বিয়ামতের ময়দানে সকল বনু আদমকে আল্লাহ বিচারের জন্য সমবেত করে ডাকবেন পিতা ও পুত্রের নাম ধরে।[33]

সুন্দর অর্থপূর্ণ আরবী ভাষার নাম ইসলামী সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। নাম দ্বারা মানুষের ধর্ম, বর্ণ-বৈশিষ্ট্য ও আত্মপরিচয় ফুটে ওঠে। নাম দ্বারাই পৃথক জাতিগত ও ধর্মীয় পরিচয় প্রকাশ পায়।

প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সামনে কোন নবাগত লোক আসলে, তিনি তার নাম জিজ্ঞেস করতেন। ভাল নাম হ'লে সন্তোষ প্রকাশ করতেন। অপছন্দ হ'লে তা পরিবর্তন করে দিতেন।

নাম রাখার ক্ষেত্রে কিছু লক্ষণীয় বিষয়-

(ক) আল্লাহর গুণবাচক নামের সাথে ‘আব্দ’ (দাস) শব্দ যুক্ত করে নাম রাখা উত্তম। যথা আব্দুল মালেক (মহাপ্রভুর দাস), আব্দুল খালেক (সৃষ্টিকর্তার দাস), আব্দুল গাফফার (মহা ক্ষমাশীলের দাস) ইত্যাদি।

(খ) ইসলামী ভাল নামের ক্রমানুসারে নবী-রাসূলদের নামের পরেই রাসূলে করীম (ছাঃ)-এর সাহচর্য ধন্য ইমলামের অগ্রগামী দল মহান সাহাবীদের নামের মালা। যে মালার প্রতিটি পুষ্প ছিল ফুটন্ত গোলাপ। যার সুবাস ও সুঘ্রাণ মুমিনের মনকে করে তোলে আমোদিত। সাহাবীগণের নামে নাম রাখা নিঃসন্দেহে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুপম ভালবাসারই বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং শিশুর নামকরণের সময় মহান সাহাবীগণের নাম হ’তে সন্তানের নাম নির্বাচন করা উত্তম। মোটকথা, শিশুর নামকরণের সময় সমাজে প্রচলিত নাম সমূহের ‘তাক্বলীদ’ বা অন্ধ অনুকরণ না করে বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ আলেম ব্যক্তির নিকট থেকে অর্থপূর্ণ ইসলামী নাম জেনে নিয়ে সন্তানের নাম রাখা।

সন্তানকে দুধ খাওয়ানোঃ

মা-বাবার জন্য মহান আল্লাহর সেরা দান সন্তান। আর মায়ের দুধ সন্তানের শ্রেষ্ঠ খাবার। প্রত্যেক মায়ের কর্তব্য হচ্ছে-- জন্মের পর থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সন্তানকে দুধ পান করানো। তবে অসুস্থ থাকলে ভিন্ন কথা।

ইসলামি শরিয়তে শিশুকে দুধ পান করানোর সময়কাল দুই চন্দ্র বছর। অর্থাৎ শিশুর বয়স হিজরি সাল অনুযায়ী দুই বছর হলে দুধ পান করানো বন্ধ করে দিতে হবে। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

وَ الۡوَالِدٰتُ یُرۡضِعۡنَ اَوۡلَادَهُنَّ حَوۡلَیۡنِ کَامِلَیۡنِ لِمَنۡ اَرَادَ اَنۡ یُّتِمَّ الرَّضَاعَۃَ ؕ

অর্থ: আর মায়েরা নিজেদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে, যদি দুধ খাওয়ার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়। (সুরা বাকারা, আয়াত: ২৩৩)

আরেক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

وَ وَصَّیۡنَا الۡاِنۡسَانَ بِوَالِدَیۡهِ ۚ حَمَلَتۡهُ اُمُّهٗ وَهۡنًا عَلٰی وَهۡنٍ وَّ فِصٰلُهٗ فِیۡ عَامَیۡنِ اَنِ اشۡکُرۡ لِیۡ وَ لِوَالِدَیۡکَ ؕ

অর্থ: আর আমি মানুষকে তার বাবা-মায়ের প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে; সুতরাং আমার ও তোমার বাবা-মায়ের শুকরিয়া আদায় করো। (সুরা লোকমান, আয়াত: ১৪)

শিশুর জন্য সর্বোত্তম খাবার হলো মায়ের বুকের দুধ। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক নবজাতক শিশুর জন্য মায়ের বুকে দুধ সৃষ্টি করে রাখেন। যা হালকা মিষ্টি ও উষ্ণ; যা নবজাতক শিশুর নাজুক অবস্থার জন্য বিশেষ উপযোগী।নবজাতক শিশুকে মায়ের বুকের দুধ পান করানোর প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'স্তন্যদানকারী ও গর্ভবর্তী মহিলা থেকে রমজানের রোজা রাখার বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। (আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ ও মিশকাত)

শিশুকে মায়ের বুকের দুধ পান করালে শিশু ও মায়ের মধ্যে এমন একটি মানসিক বন্ধন তৈরি হয়, যা চিরস্থায়ী। মুসলিম উম্মাহর সব শিশুর মায়ের উচিত কোরআন মাজিদের হুকুম অনুযায়ী তার সন্তানকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান

করানো। পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করানোর পর প্রয়োজনে অতিরিক্ত আরও ছয় মাস শিশুকে দুধ পান করানো যেতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিতে মাতৃদুগ্ধ নবজাত শিশুর জন্মগত অধিকার। যাতে কোনো কারণে এটি খর্ব না হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কেননা 'আজকের শিশু, আগামী দিনের ভবিষ্যৎ'। ইসলামি শরিয়তে শিশুকে চান্দ্রমাসের হিসাবে সর্বোচ্চ দুই বছর (২৪ মাস) পর্যন্ত দুধ পান করানো যাবে। দুই বছরের অধিক দুধ পান করানো যাবে না। উক্ত নির্ধারিত সময় পার হবার পরেও কেউ যদি নিজ সন্তানকে দুধ খাওয়ায় তাহলে তা জায়েজ হবে না এবং সন্তানের জন্য তা উপকারীও হবে না। কেননা যেটা সন্তানের জন্য উপযোগী সেটাই আল্লাহ তাআলা বিধান দিয়েছেন।

খৎনা করানোঃ

ছেলে শিশুর খৎনা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত । মুসলিম সমাজে এটি মুসলমানি বলে পরিচিত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফিতরাত (তথা নবীগণের সুন্নত) পাঁচটি : খৎনা করা, নাভীর নিচের পশম পরিষ্কার করা, বগলের পশম উঠানো, মোঁচ ছোট করা এবং নখ কাটা। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৬২৯৭)

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সময়কাল থেকে এই সুন্নতের প্রচলন হয়। নবীদের মধ্যে তিনিই প্রথম সুন্নতে খৎনা করেন। এজন্য খৎনাকে সুন্নতে ইবরাহিমও বলা হয়। হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ৮০ বছর বয়সে খৎনা করেন বলে হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আশি বছরোর্দ্ধ বয়সে খৎনা করেন। (বুখারি, মুসলিম, আল আদাবুল মুফরাদাত, ১২৫৬)

খতনার উত্তম সময়ের ব্যাপারে ফকীহগণ বলেন, শিশুর শারীরিক উপযুক্ততা ও তার বালেগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সে পৌঁছার আগেই বা এর মাঝামাঝি সময়ে যেমন, ৭-১০ বছর বা অনুর্ধ্ব ১২ বছরের মধ্যে করে নেওয়া উত্তম।

সুন্নাতে খতনার স্বাস্থ্যগত উপকারিতা

খতনা করার মাধ্যমে শরীর অধিক পাকপবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাকে। খতনা করালে শিশুদের মূত্রপথের সংক্রমণ প্রতিরোধ হয়। এর ফলে প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া, জ্বর, খাবারে অনীহা এবং স্বাস্থ্য ভালো না হওয়া ইত্যাদি রোগ থেকে ঝুঁকিমুক্ত থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের ক্ষেত্রে খতনা করালে লিঙ্গের ক্যান্সার প্রতিরোধ হয় ও যৌনবাহিত রোগের ঝুঁকি কমে।

পুরুষাঙ্গের মাথার বাড়তি চামড়ার নিচে এক ধরনের সাদা পদার্থ জমে এবং এটিই পুরুষাঙ্গের ক্যান্সারের জন্য দায়ী। লিঙ্গের মাথায় প্রদাহ, চুলকানি ও জ্বালাপোড়া করলেও খতনা করালে তা সেরে যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, পুরুষের খতনা এইচআইভি বা এইডস প্রতিরোধে একটি কার্যকর ভূমিকা রাখে, এটি আংশিক সুরক্ষা দেয়। আফ্রিকার যেসব দেশে খতনার হার বেশি, সেসব দেশে এইডসের হার তুলনামূলক কম।

সন্তানের অধিকারঃ

পৃথিবীর প্রতিটি গৃহে প্রত্যেক ব্যক্তি সন্তান কামনা করে। সন্তানের উপস্থিতি যেমন কল্যাণ বয়ে আনে, তেমনি গৃহের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করে। তাই যে গৃহে নিষ্পাপ শিশুর কল-কাকলি থাকে না, সে গৃহের শোভা ও সৌন্দর্য অনেকটাই ম্লান হয়ে যায়। সন্তান পিতা-মাতার যৌথ ফসল। মহান আল্লাহ তা'আলার সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি মানব সন্তান পিতা-মাতার নিকট পবিত্র আমানত। সন্তান লাভ করা আল্লাহর পক্ষ হ'তে এক বিশেষ নেয়ামত। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ إِنَاثاً وَّيَهَبُ لِمَن يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ-
أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَّإِنَاثاً وَّيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْماً إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْر.ٌ

'আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বন্ধ্যা। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান' *(শূরা ৪২/৪৯-৫০)*।

শিশু নির্দোষ প্রকৃতি নিয়ে পৃথিবীতে আসে। তাকে দৈহিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলে উপযুক্ত নাগরিক করার দায়িত্ব পিতা-মাতার। মহানবী (ছাঃ) বলেছেন,

مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ.

'প্রতিটি শিশুই ফিতরাতের (ইসলাম) ওপর জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়'।

পিতা-মাতা উভয়ের নিকট সন্তানের অধিকার স্বীকৃত। আমরা সন্তানের অধিকারকে দু'ভাগে বিভক্ত করতে পারি।

- মাতার নিকট থেকে প্রাপ্ত অধিকার।
- পিতার নিকট থেকে প্রাপ্ত অধিকার।

পৃথিবীর প্রতিটি গৃহে প্রত্যেক ব্যক্তি সন্তান কামনা করে। সন্তানের উপস্থিতি যেমন কল্যাণ বয়ে আনে, তেমনি গৃহের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করে। তাই যে গৃহে নিষ্পাপ শিশুর কল-কাকলি থাকে না, সে গৃহের শোভা ও সৌন্দর্য অনেকটাই

ম্লান হয়ে যায়। শিশুর শোভা ও সৌন্দর্য সম্পর্কে জনৈক কবি সুন্দর করে বলেছেন,

إِنَّمَا أَوْلاَدُنَا بَيْنَنَا * أَكْبَادُنَا تَمْشِيْ عَلَى الْأَرْضِ

لَوْ هَبَّتِ الرِّيْحُ عَلَى بَعْضِهِمْ * لاَمْتَنَعَتْ عَيْنِيْ عَنِ الْغُمْضِ.

সন্তানেরা মনে হয় যেন আমাদের মাঝে,
মোদেরি অন্তর মূর্ত হয়ে মাটিতে হাঁটে।
দমকা হাওয়াও বয়ে যায় যদি কোনও সাঁঝে,
ঘুম আসে না আমাদের চোখে সারাটি রাতে।

সন্তান আল্লাহ তা'আলার অগণিত নেয়ামতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেয়ামত ও তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ। আল্লামা আলূসী (রহঃ) বলেছেন, 'ধন-সম্পদ হচ্ছে প্রাণ বাঁচানোর উপায় আর সন্তান-সন্ততি হচ্ছে বংশ তথা মানব প্রজাতি রক্ষার মাধ্যম'। পিতা-মাতার নিকট থেকে স্নেহ-মমতাসহ সন্তানের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাবার অধিকার আছে। সালমান ফারেসী (রাঃ) বলেন, إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ. 'তোমার উপর তোমার রবের হক রয়েছে, তোমার শরীরের হক রয়েছে এবং তোমার পরিবারের হক রয়েছে। অতএব প্রত্যেককে তার অধিকার দাও'। রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে সালমান (রাঃ)-এর এ বক্তব্য পেশ করা হ'লে তিনি বলেন, 'সালমান সত্য বলেছে'।[1] কারণ মানব সন্তান পশু-পাখির মত নয় বিধায় তারা পুরোপুরি আদর-যত্ন, স্নেহ-মমতা না পেলে তাদের পক্ষে পৃথিবীতে বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব।

সন্তান পিতা-মাতার যৌথ ফসল। মহান আল্লাহ তা'আলার সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি মানব সন্তান পিতা-মাতার নিকট পবিত্র আমানত। পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে যাদের প্রচুর সম্পদ রয়েছে, কিন্তু তা ভোগ করার মতো কোন উত্তরাধিকারী নেই। তারা হাযারও চেষ্টা-সাধনা ও কামনা করে একটি সন্তান লাভ করতে পারছে না। অপরপক্ষে বহু লোক আছে যাদের যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ না থাকা সত্ত্বেও বহু সংখ্যক সন্তানের জনক। সন্তান লাভ করা আল্লাহর পক্ষ হ'তে এক বিশেষ নে'মত। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ إِنَاثاً وَّيَهَبُ لِمَن يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ- أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَّإِنَاثاً وَّيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْماً إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ.

'আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বন্ধ্যা। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান' *(শূরা ৪২/৪৯-৫০)*।

সন্তানের লালন, পরিপুষ্টি, সংরক্ষণ, পরিবৃদ্ধি সর্বোপরি আল্লাহর মর্যি মোতাবেক একজন সুন্দর মানুষ হিসাবে তার জীবন গঠন করার দায়িত্ব মাতা-পিতা উভয়ের। শিশুকে বড় করে তোলার ক্ষেত্রে পিতা-মাতা পরস্পর পরিপূরক দায়িত্ব পালন করেন। উপার্জন, শাসন, নিয়ন্ত্রণ ও বহিরাঙ্গনের শ্রমসাধ্য দায়িত্ব পিতাকে পালন করতে হয়। অভ্যন্তরীণ কাজ-কর্ম, শিশুর লালন-পালন ও প্রাথমিক শিক্ষার মত মৌলিক ও ধৈর্যসাধ্য কাজগুলি সাধারণতঃ মায়ের উপর বর্তায়। শিশু নির্দোষ প্রকৃতি নিয়ে পৃথিবীতে আসে। তাকে দৈহিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলে উপযুক্ত নাগরিক করার দায়িত্ব পিতা-মাতার। মহানবী (ছাঃ) বলেছেন,

مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ.

'প্রতিটি শিশুই ফিতরাতের (ইসলাম) ওপর জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়'।[2]

সন্তান পিতা-মাতার যৌথ উদ্যোগের এক অনুপম উপহার। পিতা-মাতা উভয়ের নিকট সন্তানের অধিকার স্বীকৃত। আমরা সন্তানের অধিকারকে দু'ভাগে বিভক্ত করতে পারি।

- মাতার নিকট থেকে প্রাপ্ত অধিকার।
- পিতার নিকট থেকে প্রাপ্ত অধিকার।

(১) মাতার নিকট থেকে প্রাপ্ত অধিকার সমূহ :

মাতার নিকট হ'তে সন্তানের যে অধিকার স্বীকৃত তা দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত।

(ক) গর্ভকালীন বা জন্মপূর্ব অধিকার।

(খ) জন্ম পরবর্তী অধিকার।

(ক) গর্ভকালীন অধিকার সমূহ :

গর্ভধারণ :

আল্লাহর অপার অনুগ্রহে গর্ভে আগত সন্তানকে মা অত্যন্ত আনন্দচিত্তে গ্রহণ করবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বহন করবেন। এজন্য তিনি তার দেহ-মনকে সুস্থ, পূত-পবিত্র ও কলুষমুক্ত রাখবেন। সন্তানের মঙ্গলের নিমিত্তে নিজ স্বাস্থ্যের প্রতি সদা সতর্ক থাকবেন। সন্তানকে আপদ মনে করে বিনষ্ট করার চেষ্টা করবেন না। প্রয়োজনে নিজের সবটুকু বিলিয়ে দিবেন গর্ভস্থ সন্তানের জন্য এবং সাগ্রহে যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত থাকবেন। তবেই সন্তানের প্রতি মায়ের যথাযথ কর্তব্য পালন করা হবে। মায়ের এ কঠিন দায়িত্ব সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে, حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ. 'তার মাতা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছেন' *(লোকমান ৩১/১৪)*।

দৈহিক গঠন :

সন্তান গর্ভে অবস্থানকালীন সময়ে মায়ের কঠোর পরিশ্রম ও বেপরোয়া চলাফেরা তার দৈহিক গঠন প্রক্রিয়ার ওপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। সন্তানের কল্যাণের জন্য চলাফেরার সময় তাকে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন পূর্বক কঠোর পরিশ্রম হ'তে বিরত থাকতে হবে। অসাবধানতার কারণে সন্তান বিকলাঙ্গ হ'তে পারে, এমনকি গর্ভপাত পর্যন্তও ঘটতে পারে। এ সময় পুষ্টিকর ফলমূল এবং উত্তম খাদ্য মা গ্রহণ করবেন। ফলমূল অন্যান্য খাদ্যের তুলনায় বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে ফলমূলে অধিক পরিমাণে সুগার আছে যা সহজে হজম হয় এবং এ থেকে শরীর গ্রহণ করে জীবনী শক্তি ও খাদ্যপ্রাণ। ফলমূল দেহের ক্ষয়প্রাপ্ত শক্তি যোগাতে সাহায্য করে। এ কারণে মহান আল্লাহ মারয়াম (আঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

وَهُزِّيْ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا- فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنا.

'তোমার দিকে খেজুর বৃক্ষের কান্ডকে ঝুঁকিয়ে নাও, সে তোমার উপর পতিত করবে তাজা উপাদেয় খেজুর, তা তুমি খাও ও পান কর এবং নয়ন জুড়াও' *(মারয়াম ১৯/২৫-২৬)*।

আহার্য গ্রহণের ব্যাপারে নিয়মানুবর্তিতা মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য কল্যাণকর। সন্তানের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে রামাযানের ছিয়াম থেকে বিরত থাকার বিষয়ে শরী‘আতের অনুমোদন আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَواةِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ وَالْحُبْلَى. ‘আল্লাহ তা‘আলা মুসাফির হ’তে অর্ধেক ছালাত এবং মুসাফির, স্তন্যদানকারিনী মাতা ও গর্ভবতী স্ত্রী লোক হ’তে ছিয়াম উঠিয়ে নিয়েছেন’। অর্থাৎ ছিয়ামের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন।[3]

মানসিক গঠন :

দৈহিক কাজ-কর্মের ন্যায় এ সময় মায়ের মানসিক কর্মেরও প্রভাব সন্তানের উপর প্রতিফলিত হয়। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থাতেও নিজেকে সংযত রেখে ঝগড়া-বিবাদ ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতি হ’তে দূরে থাকা মায়ের অপরিহার্য কর্তব্য। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) থেকে বিমুখ করতে পারে এরূপ বই-পত্র ও ধ্যান-ধারণা হ’তে মনকে পূত-পবিত্র রাখতে হবে। কেননা যাবতীয় খারাপ, অশ্লীল চিন্তা-ভাবনা পরিহার করে সৎ চিন্তা ও কুরআন-হাদীছ এবং নবীদের জীবনী পঠন ও শ্রবণ গর্ভস্থ সন্তানের সুশীল মানসিকতা গঠনে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। হারাম এবং অবৈধ উপায়ে অর্জিত খাদ্যদ্রব্য গর্ভের শিশুর উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। তাই এসব হ’তে মাকে অনেক দূরে অবস্থান করতে হবে। হারাম বর্জন করে হালাল বস্তু খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে কুরআন মাজীদে এরশাদ হয়েছে, وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَيِّبا. ‘আল্লাহ তোমাদের যা কিছু রিযিক দান করেছেন, তার মধ্যে হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার কর’ *(মায়েদাহ ৫৪/৮৮)*।

সন্তানকে সুষ্ঠু ও সুন্দর মনের একজন আদর্শবান মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার প্রধান দায়িত্ব মায়ের। মায়ের মন-মানসিকতার উপর নির্ভর করে সন্তানের মন-মানসিকতা। পৃথিবীর অধিকাংশ মা এ বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান না করার কারণে সন্তান হয় দুশ্চরিত্র। তাই একজন সুন্দর মনের সন্তান পেতে হ’লে মাকে সুন্দর পূত-পবিত্র মানসিকতাসম্পন্ন হ’তে হবে। গর্ভস্থ সন্তানের স্বার্থেই এটি প্রত্যেক মায়ের কর্তব্য এবং ভবিষ্যৎ সন্তানের এটি অধিকার। সন্তানের জন্য গর্ভবতী

মাতার এসব মু'আমালাত অবশ্যই পালনীয়। এতে মাতা ও সন্তানের পার্থিব কল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং পরকালে মাতার জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান।

(খ) জন্ম পরবর্তী অধিকার :

মায়ের স্তনে সন্তানের অধিকার :

গাছের শাখা যেমন মূলের মুখাপেক্ষী, তেমনি শিশু জন্মের পর মায়ের উপর নির্ভরশীল। শিশুর জন্মের সাথে সাথে আল্লাহর রহমতে মাতৃস্তনে সৃষ্টি হয় শিশুর উপযোগী খাবার। সুতরাং পৃথিবীতে কোন মা যেন বিশেষ কারণ ছাড়া স্বীয় দুধপান থেকে সন্তানকে বঞ্চিত করে শিশুর অধিকার অস্বীকার না করেন। সন্তানকে দুধপান করানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ প্রদান করে বলেছেন, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ‘যে সকল জননী সন্তানদের পুরো সময় পর্যন্ত দুগ্ধ দান করতে ইচ্ছা রাখে, তারা নিজেদের শিশুদেরকে পুরো দু'বছর ধরে দুগ্ধ পান করাবে' *(বাক্বারাহ ২/২৩৩)*।

মায়ের বুকের দুধ শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানযুক্ত আল্লাহ প্রদত্ত এমন তৈরী খাবার, যা শিশু সহজেই হজম করতে পারে এবং তা শিশুর শরীরের বৃদ্ধি ঘটানোতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিশুর শরীরের খাদ্য চাহিদার যে পরিবর্তন ঘটে, মায়ের বুকের দুধে অনুরূপ পরিবর্তন প্রতিদিনই ঘটে থাকে। শিশুর দেহ যে পরিমাণ তাপমাত্রা হ'লে দুধ তার দেহে কাজে লাগতে পারে, সেরূপ তাপমাত্রা মায়ের বুকের দুধে বিদ্যমান থাকে। শিশুকে সুস্থ-সুন্দর করে গড়ে তুলতে হ'লে মায়ের বুকের দুধের বিকল্প নেই। মায়ের বুকের দুধে বেশ কিছু রোগ প্রতিরোধক উপাদান থাকে। যেমন- আই.জি.এ ল্যাকটোফেরিন এবং লাইসোজাইম। এছাড়াও মায়ের বুকের দুধে প্রচুর শ্বেত রক্তকণিকা থাকে যেগুলো আবার আই.জি.এ ল্যাকটোফেরিন, লাইসোজাইম, ইন্টারফেরন তৈরী করে। বাইফিজস ফ্যাকটর নামে আরও একটি পদার্থ মাতৃদুগ্ধে পাওয়া যায়। এগুলো সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করে।

যার ফলে বাচ্চার দেহে ডায়রিয়া, কান পাকা রোগ, শ্বাসনালীর রোগ কম হয়। এছাড়া মাতৃদুগ্ধ পানে হৃৎপিন্ডের রোগ, করোনারী, খাদ্যনালীর রোগ প্রভৃতি প্রতিরোধ করে। মায়ের দুধ পান শিশুর চেহারার লাবণ্য সৃষ্টি করে, বাকশক্তি ও সাধারণ বুদ্ধি বিকাশে সাহায্য করে।

বিশেষ কারণ ছাড়া কোন মা শিশুকে দুধ পান হ'তে বঞ্চিত করে যে ক্ষতি সাধন করে, তা অপূরণীয়। কারণ স্তন্যদান মায়ের মধ্যে সৃষ্টি করে শিশুর প্রতি এক বিশেষ স্নেহ প্রবণতা ও আবেগ-অনুভূতি। যে সকল মহিলা তাদের চাকচিক্য ও রূপ-লাবণ্য নষ্ট হবার ভয়ে শিশুকে বুকের দুধ পান করানো হ'তে বিরত থাকে, তাদের এ হীন মানসিকতা এখুনি পরিত্যাগ করা উচিত।

শিশুর স্বাস্থ্য, মন-মানসিকতা, চরিত্র ও রুচি গঠনে মায়ের দুধের ভূমিকা যথেষ্ট। বিশেষ কারণ বশতঃ কোন শিশুকে আপন মা ব্যতীত অন্য মহিলার দুধ পান করানোর প্রয়োজন হয়ে পড়লে, সেক্ষেত্রে দুশ্চরিত্রা ও অসুস্থ মহিলার দুধ পান করানো হ'তে বিরত রাখতে হবে।

স্নেহের পরশে প্রতিপালন :

সন্তান মায়ের হৃদয়ের দরদ ও পরম স্নেহ-যত্নের দাবীদার। মা কোন প্রকার ঘৃণা না করে আন্তরিক ভালবাসা দিয়ে সন্তানের পরিচর্যা করবে। আদর-স্নেহ হ'তে বঞ্চিত সন্তানদের স্বভাব-চরিত্রে বিরূপ পড়ে থাকে। স্নেহের পরশে প্রতিপালনকারী মা আল্লাহর অনুগ্রহের অংশীদারিণী হয়ে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার হাসান বিন আলী (রাঃ)-কে স্বস্নেহে চুম্বন করেন। আকরা বিন হাবিস আত-তামিমী (রাঃ) এ দৃশ্য দেখে বললেন, إِنَّ لِيْ مِنَ الْوَلَدِ عَشَرَةً مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا مِّنْهُمْ. 'আমার দশটি সন্তান আছে, আমি তাদের কাউকেই কোন দিন চুম্বন করিনি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, إِنَّهُ مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَم 'যে দয়া করে না, তাকে দয়া করা হয় না'।[4]

অন্য আরেকটি হাদীছে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَدِمَ نَاسٌ مِّنَ الْأَعْرَابِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوْا : أَتُقَبِّلُوْنَ صِبْيَاَكُمْ؟ قَالُوْا : نَعَمْ، فَقَالُوْا لَكِنَّا وَاللهِ! مَانُقَبِّلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْلِكُ أَنْ كَانَ اللهُ قَدْ نَزَعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَةَ.

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদল বেদুঈন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, তোমরা কি তোমাদের সন্তানদেরকে চুমু দাও? উপস্থিত সবাই বলল, হ্যাঁ। তখন তারা বলল, কিন্তু আল্লাহর কসম! আমরা তাদেরকে চুমু দেই না। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'আল্লাহ তোমাদের অন্তর থেকে মায়া-মমতা তুলে নিলে আমি কী করতে পারি'।[5]

সন্তান জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে মায়ের নিকট অধিক সময় থাকে। তাই মায়ের অপত্য স্নেহের পরশ না পেলে সে নিজেকে অসহায় মনে করবে। মনরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, এ অসহায়ত্বের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এমন রূপ ধারণ করবে যা সারা জীবন খেসারত দিয়েও পরিশোধ করা যাবে না।

পিতৃহারা সন্তানের প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ :

সন্তানকে সমাজ ও সংসার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পিতা যেমনভাবে দায়িত্ব পালন করবেন, অনুরূপভাবে মাকেও তাতে অংশগ্রহণ করতে হবে। আর পিতা মারা গেলে মা-ই এ মহান দায়িত্ব পালনে সব রকম সহযোগিতা প্রদানে ব্রতী হবেন। স্বামীর মৃত্যুর পর চেহারা-সৌন্দর্য থাকা সত্ত্বেও অন্যের গৃহে না গিয়ে ইয়াতীম সন্তানদের প্রতিপালন ও প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে পারেন এমন মহিলা সত্যিই নারী জাতির গৌরব। এ গৌরব অর্জনের জন্য তাকে প্রতিটি পদে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।

প্রাথমিক জ্ঞান দান :

শিশু জন্ম হ'তে বিদ্যালয়ে গমনের পূর্ব পর্যন্ত মায়ের সান্নিধ্যে লালিত-পালিত হয়। আর মায়ের কোল থেকেই শিশুর শিক্ষা তথা জ্ঞান আহরণের যাত্রা শুরু হয়। শিশুর মন এ সময় অত্যন্ত কোমল থাকে, সে জন্য তখন তাকে যে শিক্ষা দেয়া হয়, তা সে সহজে গ্রহণ করে। এ শিক্ষা তার ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় হিসাবে কাজ করে। তাই শিশুর মুখে আধো আধো বুলি ফুটতে শুরু করলে মাকে কথা বলার সময় অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। সন্তানের সামনে কটু বা খারাপ বাক্য উচ্চারণ করা হ'তে সংযত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করা প্রয়োজন। মায়ের মিষ্টিমিষ্টি কথা শিশুর অন্তরে প্রবলভাবে রেখাপাত করে। মা ইসলামের সুমহান শিক্ষার কথা সুমধুর ভাষায় শিশুর মাঝে ছড়িয়ে দিবেন। তাকে ইসলামের প্রাথমিক বিষয়সমূহ শিক্ষা দিবেন। অধিক ভোজনের অপকারিতা, জোরে চীৎকার করে কথা না বলা সম্পর্কে জ্ঞান দান করবেন। দুষ্টু প্রকৃতির ছেলে-মেয়েদের সাথে মিশতে, মিথ্যা ও অহেতুক কথা বলার মত অশালীন কাজ থেকে তাদেরকে বিরত রাখবেন। নিজেদের কাজ যথাসম্ভব নিজ হাতে করার অভ্যাস গড়ে তুলতে শিক্ষা দিবেন। ভাল কাজ করলে ধন্যবাদ প্রদান এবং মন্দ কাজ করলে মৃদু শাসন করতে হবে।

শিশু একটি পুষ্পকলি। মা তার মধ্যে মানবীয় গুণাবলী, সুন্দর চরিত্রের রং, রূপ ও গন্ধ ভরে দিবেন। মায়ের অভিপ্রেত অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে শিশুর শিক্ষা হ'লে বৃহত্তর সমাজ ও জাতি নিঃসন্দেহে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনে অভ্যস্ত করা :

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সৌন্দর্যের মূল ভিত্তি। কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত তার শরীরকে পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করার ব্যাপারে সচেষ্ট না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ইসলামের মানদন্ডে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত এবং সর্বদিকে সম্মানিত ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত পানাহার ও পোষাক-পরিচ্ছদের বেলায় সকল প্রকার ময়লা ও অপরিচ্ছন্নতা থেকে দূরে থাকতে পারবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে না। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি মা তার ছোট্টমণিকে শিশুকাল থেকে শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে সচেষ্ট হবেন। শরীরের রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকার নিমিত্তে কাপড়-চোপড় পরিচ্ছন্ন, খাদ্যদ্রব্য পবিত্র রাখা এবং খাদ্যের পাত্র পরিষ্কার করা একান্ত দরকার। এ ব্যাপারে মা সন্তানকে অভ্যস্ত করে তুলবেন। কারণ পবিত্রতা আল্লাহর নৈকট্য লাভে সহায়তা দান করে। এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদে এরশাদ হয়েছে, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকেও ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*।

যেমনিভাবে নিজের শরীর ও মনকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, তেমনিভাবে ঘর-দরজা, বাড়ীর চারপাশের পরিবেশ, রাস্তা-ঘাট, পরিষ্কার রাখতে হবে। একথা মা তার সন্তানকে শৈশব থেকে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে এ ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলবেন। রাসূল (ছাঃ) এ সম্পর্কে বলেন, نَظِّفُوْا أَفْنِيَتَكُمْ. 'তোমরা তোমাদের বাড়ির আঙ্গিনা ও সম্মুখ ভাগ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখ'।[6]

শৈশবে শিশুর মন অত্যন্ত পবিত্র এবং নরম থাকে। নরম মাটিকে কুমার যা ইচ্ছা তা করতে পারে। অনুরূপভাবে মা পবিত্র নরম হৃদয়ের শিশুটিকে

পবিত্রতা তথা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে যেরূপ প্রশিক্ষণ দান করবেন, সেভাবে জীবনের বাকী দিনগুলি সে অতিবাহিত করবে।

সৌজন্যবোধ শিক্ষা দান :

শিশু-সন্তান মাকে বেশী অনুসরণ করে। তাই মা শৈশবেই শিশুকে সৌজন্যবোধ শিক্ষা দিবে। যাতে করে শিশু প্রশংসনীয় কাজ ও সুন্দর চরিত্রে সজ্জিত হয়ে বড় হ'তে পারে। সন্তান যেহেতু বিশ্ব প্রকৃতির পবিত্র উপাদান এবং সমাজরূপী প্রাসাদের ইট সমতুল্য, সেহেতু সন্তানকে ভদ্রতা, বিনয়, সরলতা, সততা, সত্যবাদিতা ইত্যাদি গুণাবলী শিক্ষা দানে মাতা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন। একজন শিশু পরবর্তী জীবনে পৃথিবীর সকলের নিকট এক আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার জন্যই মায়ের নিকট হ'তে সে এই গুণাবলী অর্জনের অধিক হকদার।

উন্নত মন-মানসিকতা গঠন :

মানুষ আল্লাহর খলীফা। আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালন করাই মানুষের প্রকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্য। প্রতিটি মানুষের উপর একদিকে রয়েছে স্রষ্টার অধিকার, আর অপর দিকে রয়েছে অগণিত সৃষ্টির অধিকার। স্রষ্টা এবং সৃষ্টির অধিকার সুন্দররূপে আদায়ের জন্য সন্তানের উন্নত মন-মানসিকতা গঠন করার ব্যাপারে মাকে সচেষ্ট হ'তে হবে। শিশুর মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি জাগ্রত করতে হবে। তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে আল্লাহর অধিকার পূর্ণরূপে আদায় করলে পরকালে চির সুখের স্থান জান্নাত পাওয়া যাবে। আর তা আদায় না করলে চরম শাস্তির সম্মুখীন হ'তে হবে। সৃষ্টির প্রতি অধিকার বলতে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন তথা বিশ্বের সকল সৃষ্টজীবের সাথে উত্তম আচরণ করলে ইহজীবনে শান্তি ও পরজীবনে পুরষ্কার লাভে সক্ষম হবে, একথা তাদের মনের মধ্যে গ্রোথিত করে দিতে হবে। এছাড়াও অপসংস্কৃতির সয়লাব থেকে বেঁচে থাকার জন্য তাদেরকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে। তাদের মধ্যে বীরত্ব, দৃঢ়তা সৃষ্টি করা এবং ভীরুতা-কাপুরুষতা পরিহারের ব্যাপারে সচেতনতা

সৃষ্টি করতে হবে। বৈধ সীমানার মধ্যে অবস্থান করে নিজের আত্মসম্মানবোধ ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দিতে হবে। অপরপক্ষে অন্যের সম্মান যেন বিনষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মোটকথা তাদেরকে পরিকল্পিত জীবন-যাপনে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে, যাতে করে তারা নিজেদেরকে বিশ্ববাসীর সামনে এক উত্তম উদাহরণ হিসাবে পেশ করতে সক্ষম হয়।

ব্যবহারিক শিক্ষা দান :

দৈনন্দিন জীবনে এমন অনেক কাজ রয়েছে, যা একজন মানুষ জীবনের ঊষালগ্ন হ'তে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হ'লে বড় হয়ে তা পালনে ব্যর্থ হয়। নিজের ব্যবহৃত কাপড়-চোপড় গোছানো, ঘর-দুয়ার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, অযূ-গোসল করে পাক-ছাফ হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে সন্তানকে শিক্ষা দিতে হবে। বিশেষ করে মেয়ে সন্তানকে গৃহস্থালী কাজ-কর্মে অভ্যস্ত করে তোলা, রান্না-বান্না ও অন্যান্য কাজের শিক্ষা দিয়ে দক্ষ ও সুনিপুণ করে গড়ে তুলতে হবে। যাতে ভবিষ্যতে তারা আদর্শ গৃহিনী হ'তে পারে। মানুষের চলার পথে ব্যবহারিক জীবনের কাজগুলি শিক্ষা দিয়ে সন্তানকে ভবিষ্যৎ জীবনের সোপান তৈরী করে দিতে মা একটি উত্তম প্রতিষ্ঠান। একথা স্মরণ রেখে প্রত্যেক মায়ের স্বীয় দায়িত্ব পালন করাই সন্তানের অধিকার।

তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া :

সন্তানের তত্ত্বাবধান করা একজন আদর্শ মায়ের বড় কর্তব্য। সন্তানকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সৎ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই মাকে তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তে হয়। সন্তানকে উত্তমরূপে গড়ে তোলার ব্যাপারে মাকেই মমতাময়ীর ভূমিকা পালন করতে হবে। ইসলাম মাকে গৃহের দায়িত্বশীলরূপে স্থির করেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'প্রত্যেক আদম সন্তান কর্তা। পুরুষ তার পরিবারের কর্তা আর নারী তার ঘরের কর্ত্রী'।[7] হাদীছে এসেছে, وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ. 'স্ত্রীরা নিজের স্বামীর ঘর ও তার সন্তানের রক্ষক, সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[8]

সন্তানের প্রতিটি ক্ষেত্রে মা উত্তম পরিচালক হিসাবে পরিচয় দিতে না পারলে শিশুর উপরে উঠার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। চালক একটু অমনোযোগী হবার কারণে যেমনভাবে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটে, তেমনভাবে মা তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে সামান্যতম বেখেয়াল হ'লে সন্তানের জীবনের সোনালী সূর্য অস্তমিত হয়ে কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। অতএব এ বিষয়ে আমাদের আরো সচেতন হ'তে হবে।

(২) পিতার নিকট থেকে প্রাপ্ত অধিকারসমূহ :

সন্তানের প্রতি পিতার দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন এবং দীর্ঘমেয়াদী। মাতৃগর্ভে সন্তানের সঞ্চারণ শুরু হবার সময় হ'তে বড় হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর দায়িত্ব অব্যাহত থাকে। এজন্য ইসলাম দাম্পত্য জীবনের ব্যয়ভার বহন ও দৈহিকভাবে সক্ষম ব্যক্তিকেই বিবাহ করার অনুমতি প্রদান করেছে।[1] পিতার নিকট হ'তে প্রাপ্ত সন্তানের অধিকারগুলোকে আমরা দু'পর্যায়ে বিভক্ত করতে পারি।

(ক) সন্তানের পৃথিবীতে আগমনের পূর্ববর্তী অধিকার।

(খ) সন্তানের পৃথিবীতে আগমনের পরবর্তী অধিকার।

(ক) সন্তানের পৃথিবীতে আগমনের পূর্ববর্তী অধিকার সমূহ

১. সন্তানের জন্য পুণ্যবতী মায়ের ব্যবস্থাকরণ :

ইসলাম শুধু যে জন্মের পর থেকেই শিশুদের প্রতি গুরুত্ব দেয় তা নয়; বরং সন্তান তার পিতার ঔরসে বা মায়ের গর্ভে তার আকৃতি সৃষ্টি হবার পূর্ব থেকেই তার প্রতি গুরুত্বারোপ প্রদান করেছে। পুরুষদের প্রতি বিবাহ সম্পর্কে ইসলাম নির্দেশ প্রদান করেছে যে, প্রস্তাবিত মহিলা যেন আল্লাহভীরু হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিবাহের ক্ষেত্রে বংশ, সম্পদ, সৌন্দর্য ও আল্লাহভীরুতার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاك. 'মহিলাদেরকে চারটি গুণের অধিকারিণী দেখে বিবাহ করা হয়। (ক) তার ধন-সম্পদ (খ) বংশমর্যাদা (গ) তার সৌন্দর্য ও (ঘ) তার ধর্মপরায়ণতা। তোমরা দ্বীনদার মহিলাকে বিয়ে

করে ধন্য হও, অন্যথা তোমার উভয় হাত ধুলায় ধূসরিত হবে'। (অর্থাৎ তুমি লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে)।[2]

বিবাহ করার সময় মহিলার রূপ বা সম্পদই যেন সবকিছু বলে বিবেচিত না হয়; বরং এর যে কোন একটির সাথে ধর্মপরায়ণতার গুণটি অবশ্যই যুক্ত হ'তে হবে। মহিলা যেন ভদ্র পরিবারের সদস্যা হন। কারণ তার সন্তানেরা তার চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

ওমর (রাঃ) জনৈক পুত্র কর্তৃক সন্তানের প্রতি পিতার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হ'লে উত্তরে বলেছিলেন, 'পিতার দায়িত্ব হচ্ছে, তিনি যেন সন্তানের মাতা নির্বাচনে ভুল না করেন'।[3] ভাল সন্তানের জন্যে সতী-সাধ্বী মা হওয়া শর্ত। আর এ শর্তটি পিতা পূরণ করে সন্তানের হক আদায়ে সচেষ্ট হবেন।

২. গর্ভবতী মায়ের পুষ্টি, সুস্থতা ও সেবাযত্নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ :

শিশু সুস্থ ও শক্তি-সামর্থ্যবান হওয়া প্রতিটি পরিবারের কাম্য। এজন্য গর্ভবতী মায়ের প্রয়োজনীয় খাদ্যের যোগান এবং অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে পিতাকে। গর্ভবতী মায়ের প্রতি পিতার যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্যই গর্ভস্থ সন্তানের অধিকার। এই দায়িত্ব পিতা নিষ্ঠার সাথে পালন করলে সম্পূর্ণ সুস্থভাবে শিশু জন্মলাভ করার যথার্থ অবস্থা ও পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

সাধারণ অবস্থার চেয়ে গর্ভকালীন সময়ে মায়ের পুষ্টিকর খাদ্যের বেশী প্রয়োজন হয়। মা সুস্থ সবল না থাকলে, সুস্থ সবল সন্তান জন্ম দিতে পারে না। কাজেই যে সমস্ত খাদ্যে বেশী পরিমাণ ভিটামিন রয়েছে, সেরূপ খাদ্য সরবরাহ করতে পিতা সদা সচেষ্ট থাকবেন।

মায়ের দৈহিক পরিশ্রম লাঘবের জন্যে পিতাকে গৃহস্থালী কাজে সহায়তা করতে হবে। সন্তানের মঙ্গলার্থেই গর্ভধারিণী মাতার স্বাস্থ্য রক্ষা, সুস্থ দেহ, মন-মানসিকতা গঠন ও পবিত্র রাখা এবং হালাল খাদ্যের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা পিতার দায়িত্ব। সর্বোপরি সর্বাঙ্গীন সুন্দর সন্তান প্রাপ্তির আশায় মাকে পুষ্টিকর উপাদেয় খাবার যোগান দেওয়া, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে থাকার ব্যবস্থা করা এবং ইসলামী ভাবধারা সম্বলিত পুস্তকাদি সরবরাহ করা পিতার

কর্তব্য। একজন অনাগত সন্তান সুস্থ ও সুন্দরভাবে পৃথিবীতে আসার জন্য এ সমস্ত বিষয় একজন আদর্শ পিতার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

(খ) পৃথিবীতে আগমনের পরবর্তী অধিকার সমূহ :

শিশুরা হচ্ছে জীবনের কিশলয়, আশার ফসল, মানুষের চোখ জুড়ানো ধন, উম্মাহর প্রস্ফূটিত ফুল, মানবতার ভবিষ্যত, সত্যিকার প্রভাতের উদয়, ঝলমলে আগামী দিন, গৌরবময় অতীতের প্রত্যাবর্তন এবং উম্মাহর কীর্তিমান মর্যাদার শাসন সংরক্ষিত রাখার একটি মাধ্যম। সন্তান মানুষের ইপ্সিত আশার প্রতীক। তাই সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর পরেই কতগুলি মৌলিক দায়িত্ব রয়েছে যেগুলো পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে তা পিতাকে পালন করতে হয়। এই গুরু দায়িত্ব হ'তে অমনোযোগী হ'লে তাকে পরকালে জবাবদিহি করতে হবে। সন্তানকে যথাযথভাবে প্রতিপালন করা ও তাদের নৈতিকতার উন্নয়নে পিতা যত্নবান না হ'লে অথবা অর্পিত দায়িত্ব পালন না করলে সন্তানের ভবিষ্যৎ হয়ে উঠে দুর্বিসহ। কাজেই একজন পিতা সন্তানের সঙ্গে বৈরী মনোভাব পরিহার করে বন্ধুসুলভ আচরণ করবেন। সর্বদা সন্তানের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করবেন, আদর ও স্নেহ করবেন এবং প্রয়োজনে নছীহত করবেন।

সন্তানের শিক্ষা দীক্ষাঃ

শিশুরা মানব সমাজের সম্পদ। দেশ ও জাতির ভবিষ্যত। আজকের শিশু আগামী দিনের পরিচালক। যুগ ও সময়ের পথনির্দেশক। মানব ও মানবতার পথপ্রদর্শক। তাদের সঠিক শিক্ষা-দীক্ষা তাই একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষার সবচেয়ে উপযোগী সময় শৈশব। গ্রহণ ও ধারণের সর্বোত্তম সময় শৈশব। শিশুরা যেকোনো জিনিস খুব সহজে ধারণ করতে পারে। তাদের স্মৃতি থেকে তা কখনো মুছে যায় না। গবেষকগণ সত্য বলেছেন, 'শৈশবের শিক্ষা যেন পাথরে অংকিত নকশা।'শৈশব থেকেই শিশুর আকীদা-বিশ্বাস ও আখলাক-চরিত্রকে ইসলামের আলোয় আলোকিত করতে হবে। শিশুরা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয় পরিবেশ দ্বারা। পরিবেশ তাদের মনে গভীর রেখাপাত করে। এজন্য তাদেরকে ঘরে ও বাইরে দ্বীনী পরিবেশে রাখতে হবে, যাতে তারা ইসলামী আদর্শে বেড়ে

উঠতে পারে এবং এটি তাদের স্বভাবে পরিণত হতে পারে। নতুবা ধীরে ধীরে সে বিজাতির বোধ-বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান গ্রহণ করতে শুরু করবে, বড় হয়ে বিপথগামী হয়ে পড়বে, যা এই নিষ্পাপ শিশুর উপর যেমন অবিচার তেমনি মানবজাতির উপরও।

সন্তানকে আদর্শ ও নেক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার যথাসাধ্য চেষ্টা করা, উত্তম শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়া বাবা মায়ের অবশ্য কর্তব্য, শিশুর অধিকার। সাধারণভাবে প্রত্যেকটি শিশুই উত্তম প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এরপর সে যে শিক্ষা পায় সেভাবেই বেড়ে ওঠে।

আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, প্রত্যেক নবজাতকই ফিতরাত বা স্বাভাবিক উত্তম প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার বাবা-মা তাকে ইয়াহুদি, নাসারা বা অগ্নিপূজক হিসেবে গড়ে তোলে।

(সহিহ বুখারি: ২৩)

এ হাদিস থেকে বোঝা যায় সন্তানের ভালো বা মন্দ মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের শিক্ষা-দীক্ষার বড় প্রভাব থাকে। তাই শিশুকাল থেকেই উত্তম মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হয়। উত্তম শিক্ষা-দীক্ষা দিতে হয়। আল্লাহর নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিশুকাল থেকেই সন্তানদের উত্তম শিক্ষা ও দীনি আমলে উদ্বুদ্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আমর ইবনে শুয়াইব (রা.) থেকে বর্ণিত আল্লাহর নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা নিজের সন্তানদের সাত বছর বয়স থেকে নামাজের নির্দেশ দাও। দশ বছর বয়সে নামাজ না পড়লে তাদের প্রহার করো।

(আবু দাউদ: ৪৯৫)

সন্তানকে উত্তম মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে সে ইহজীবনে যেমন চোখের শীতলতা ও সওয়াবের কারণ হয়, মৃত্যুর পরও নেক সন্তানের কারণে মানুষের সওয়াব জারি থাকে। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আদম সন্তান যখন মারা যায়, তখন তার তিন প্রকার আমল ছাড়া অন্য সব

আমলের ধারা বন্ধ হয়ে যায়; ১. সদকায়ে জারিয়া (ফায়েদা অব্যাহত থাকে এ রকম সদকা যেমন মসজিদ নির্মাণ করা, কূপ খনন করে দেওয়া ইত্যাদি)
২. ইলম বা জ্ঞান যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে থাকে
৩. সুসন্তান যে তার জন্য নেক দোয়া করতে থাকে। (সহিহ মুসলিম)

সন্তানকে ইসলামিক শিক্ষায় গড়ে তোলাঃ

প্রারম্ভিক শৈশব হচ্ছে সেই সময়টা, যখন শিশুর যত্ন ও বেড়ে ওঠার বিষয়ে সবচেয়ে বেশি খেয়াল করা প্রয়োজন। শিশুর জন্মের পর প্রথম আট বছর তার বেড়ে ওঠার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল। এই সময়টি পরিবর্তনের এবং সে পরিবর্তন শারীরিক ও মানসিক উভয় ধরনের।

ছোটবেলা থেকেই শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে যত্নবান হওয়া মা-বাবার দায়িত্ব।
শিশুকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা হলো—

★উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া : লুকমান (আ.) তাঁর সন্তানকে বলেন, 'আর তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।

আর জমিনে দম্ভভরে চলাফেরা কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করেন না। আর তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন কোরো, তোমার আওয়াজ নিচু কোরো; নিশ্চয়ই সবচেয়ে নিকৃষ্ট আওয়াজ হলো গাধার আওয়াজ।' (সুরা লুকমান, আয়াত : ১৮-১৯)

★মন্দ কাজের ব্যাপারে সচেতন করা : শিশুর কাছে মন্দ কাজ ও চুরিকে অপছন্দনীয় করে তুলতে হবে।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ব্যভিচারী ব্যভিচার করার সময় মুমিন থাকে না, মদপানকারী মদপান করার সময় মুমিন থাকে না, চোর চুরি করার সময় মুমিন থাকে না। (বুখারি, হাদিস : ৫৫৭৮)

সন্তানকে নামাজ আদায়ে অভ্যস্ত করাঃ শৈশব থেকেই শিশুদের আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া বিধিবিধান পালনে অভ্যস্ত করে তোলা উচিত। আল্লাহর বিধানের মধ্যে অন্যতম হলো নামাজ। নামাজ মানুষকে সব ধরনের অশ্লীলতা থেকে দূরে। এ বিষয়ে আল্লাহতায়ালা বলেন, নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীল ও মন্দ কাজ

থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা করো আল্লাহ তা জানেন। সুরা আনকাবুত : ৪৫

যারা সন্তানকে নামাজের নির্দেশ দেবে এবং তাদের নামাজে অভ্যস্ত করার চেষ্টা করবে, তাদের জন্য সবচেয়ে বড় পুরস্কার হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে ইসমাইল (আ.)-এর প্রশংসা করে বলেছেন, 'সে তার পরিবারকে নামাজ ও জাকাতের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল আল্লাহর সন্তোষভাজন বান্দা।' (সুরা মরিয়ম: ৫৫

সন্তানকে নামাজে অভ্যস্ত করতে কতিপয় করনীয়-

- ১. নিজে নামাজে যত্নবান হওয়া : শিশুরা বড়দের দেখে শেখে। তাই সন্তানকে নামাজে অভ্যস্ত করার প্রথম শর্ত মা-বাবা ও অভিভাবক নিজেরা নামাজের প্রতি যত্নবান হওয়া। নতুবা শুধু উপদেশ খুব বেশি ফলপ্রসূ হবে না। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনরা, তোমরা যা করো না, তোমরা তা কেন বলো? তোমরা যা করো না তোমাদের তা বলা আল্লাহর কাছে অতিশয় অসন্তোষজনক।' (সুরা সফ, আয়াত : ২-৩)

২. নামাজ পড়ার সময় সন্তানকে পাশে রাখা : মা-বাবা যখন নামাজ আদায় করবে সন্তানকে পাশে রাখবে। যেন সন্তান তার অনুকরণ করে। (বুখারি, হাদিস : ৫১৬)

৩. বুঝমান সন্তানকে মসজিদে নেওয়া : রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে বুঝমান ও অবুঝ উভয় ধরনের শিশুকে মসজিদে নেওয়ার বিবরণ পাওয়া যায়।নাসায়ি, হাদিস : ৫০)

তবে ইসলামী আইনজ্ঞরা বলেন, শিশু বুঝমান হওয়া বা তার বয়স সাত বছর হওয়ার আগে মসজিদে না নেওয়া উত্তম। কেননা এতে অভিভাবক ও অন্য মুসল্লিদের নামাজে সমস্যা তৈরি হতে পারে।

৪. হাতে-কলমে নামাজ শিক্ষা দেওয়া : সন্তান সাত বছর বয়সে উপনীত হলে তাকে হাতে-কলমে নামাজ শিক্ষা দেবে মা-বাবা। রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদের হাতে-কলমে নামাজ শিক্ষা দিতেন।

তিনি বলেন, 'তোমরা আমাকে যেভাবে নামাজ আদায় করতে দেখো, সেভাবে নামাজ আদায় করো।' (বুখারি, হাদিস : ৬০০০৮)

৫. নামাজের জন্য পুরস্কার দেওয়া : সন্তান যেন নামাজের প্রতি যত্নবান হয়, এ জন্য তাকে পুরস্কার দেওয়া যেতে পারে। ফজরের নামাজের জন্য উঠলে, মসজিদে নামাজের জামাতে হাজির হলে, নামাজের জন্য প্রয়োজনীয় দোয়া, তাসবিহ ও সুরা মুখস্থ করলে তাকে পুরস্কৃত করা যেতে পারে। এ ধরনের উৎসাহমূলক পুরস্কার প্রদানে ইসলাম উৎসাহিত করে। সম্প্রতি তুরস্কসহ বিভিন্ন দেশে এই পদ্ধতি অবলম্বন করে বেশ সাড়া পাওয়া গেছে।

৬. নামাজের গুরুত্ব তুলে ধরা : সন্তানের সামনে নামাজের গুরুত্ব তুলে ধরা প্রয়োজন। নামাজের গুরুত্ব, নামাজ আদায়ের সুফল, নামাজ না পড়ার কুফল ও শাস্তি ইত্যাদি বর্ণনা করা যেতে পারে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'অন্ধকারে মসজিদে গমনকারীর জন্য কিয়ামতের দিন পূর্ণাঙ্গ আলো লাভের সুসংবাদ দাও।' (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ৫৬১)

৭. নামাজ সম্পর্কিত ঘটনা শোনানো : নামাজ কিভাবে ফরজ হলো, রাসুলুল্লাহ (সা.) নামাজের প্রতি কতটা যত্নবান ছিলেন, সাহাবিরা যুদ্ধের ময়দানেও কিভাবে নামাজ আদায় করেছিলেন এবং বুজুর্গ আলেমরা নামাজের মাধ্যমে কিভাবে জীবনের বিভিন্ন সংকট মোকাবেলা করেছেন—সেসব ঘটনা শিশুদের শোনালে তারা নামাজে উৎসাহি হবে।

৮. নামাজের জন্য জবাবদিহি : সন্তান ঠিকমতো নামাজ পড়ছে কি না, সেদিকেও মা-বাবাকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং নামাজে অলসতা করলে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। (আবু দাউদ, হাদিস : ১৩৫৬)

৯. প্রয়োজনে শাস্তি দেওয়া : মহানবী (সা.) বলেন, 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে নামাজের নির্দেশ দাও। তাদের বয়স ১০ বছর হওয়ার পর নামাজের জন্য প্রহার করো এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।' (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৯৫)

১০. সন্তান নামাজি হওয়ার জন্য দোয়া করা : সন্তান যেন নামাজের প্রতি যত্নবান হয় এ জন্য মা-বাবা দোয়া করবে। সন্তানকে নামাজি বানানোর জন্য দুয়া:

সূরা ইব্রাহিমের ৪০ ও ৪১ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন,

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (40) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ(41) ُ

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার বংশধরদের কিছুকে যথাযথ নামাজ প্রতিষ্ঠাকারী করো। হে আমার প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা গ্রহণ কর।" (১৪:৪০)

“হে আমার প্রতিপালক! হিসাব গ্রহণের দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং বিশ্বাসীগণকে ক্ষমা কর।" (১৪:৪১)

সন্তানকে শিষ্টাচারের শিক্ষা প্রদানঃ

সন্তান যতই বড় হোক আর যতই ভালো হোক, খেয়াল রাখতে হবে সে যেন পথভ্রষ্ট না হয়। যদি সে পথভ্রষ্ট হয় তাহলে তাকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি মারা যান বা সে মারা যায়। যেমনটা হয়েছিল নুহ (আঃ) এর ক্ষেত্রে। ৯৫০ বছর বয়সেও তিনি নিজের ছেলেকে আসন্ন ধংসের মুখ থেকে বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন!

একটি মুসলিম পরিবারের মুল ভিত্তিই হচ্ছে তাওহীদ তাই শুধু মাত্র বাচ্চাদেরকে শুদ্ধ তাজউইদ দিয়ে কুরআন মুখস্ত করালেই চলবে না; বরং কুরআনের অন্তর্নিহিত শিক্ষাকে হৃদয়ঙ্গম করে তা প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার করতে হাতে কলমে শিক্ষা দিতে হবে। এবং বাচ্চাদের জন্য সবচেয়ে সফল শিক্ষা পদ্ধতি হচ্ছে বাবা-মাকে দেখে শেখা। বাবা-মায়ের দৃঢ় ঈমান ও সদাচারণ তাদের সন্তানদেরকে ঈমানদার ও আদর্শ মুসলিম হিসাবে সমাজে আত্মপ্রকাশ করতে সাহায্য করবে। শুধুমাত্র বাবা-মায়ের অবহেলার কারনে আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি প্র্যাকটিসিং অথবা অর্ধ প্র্যাকটিসিং মুসলিম পরিবারে নাস্তিক সন্তান তৈরি হচ্ছে। প্রত্যেক মুসলমানই একেকজন দা'ঈ যার কাজ হল মানুষকে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের নির্দেশিত পথের দিকে আহ্বান করা। আর তাই প্রথমেই আল্লাহ্র নির্দেশিত পথের দিকে আহ্বান করতে হবে নিজের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে যারা সবচেয়ে কাছের মানুষ। পাশাপাশি তাদেরকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে হবে যাতে শিষ্টাচার বহির্ভূত কোন কাজ তাদেরকে দিয়ে না হয়। রাসূল সা: বলেছেন, "তোমরা তোমাদের সন্তানদের মহৎ করে গড়ে তোলো এবং তাদের উত্তম আদব তথা শিষ্টাচার শিক্ষা দাও" [মুসলিম]। অপর হাদিসে রাসূল সা: বলেন, "সন্তানকে আদব তথা শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া সম্পদ দান করা অপেক্ষা উত্তম" [বায়হাকি]। পরিবার, সমাজের বা রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম একক। ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম আর এই শিক্ষার প্রথম স্তর হলো পরিবার। সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবনে সঠিক ভূমিকা পালনের মৌলিক শিক্ষা লাভ করা হয় পারিবারিক পরিবেশে। শৈশবেই শিশুকে আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া আবশ্যক, যেন শিশু প্রশংসনীয় ও সুন্দর চরিত্রের

অধিকারী হয়ে গড়ে উঠতে পারে। মানুষ ও সমাজের জন্য সে হবে অনুকরণীয়, তার চারিত্রিক গুণাবলির মাধ্যমে সত্যের আলো ছড়াবে সমাজে ও মানুষের হৃদয়ে। একইসাথে অন্ধকার সমাজের দিকভ্রান্ত মানুষকে দেখাবে সত্যের পথ, মুক্তির পথ। শিষ্টাচার একজন মানুষের জীবনকে পরিশীলিত করে, সমৃদ্ধ করে, চেতনাকে জাগ্রত ও বোধকে শাণিত করে। তাই মানুষের সুখী ও শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য নৈতিকতা এবং শিষ্টাচার শিক্ষার প্রয়োজন অপরিহার্য। শিশুদের শিষ্টাচার-সম্পন্ন করো গড়ে তোলার জন্য তাদের প্রতিদিনই উৎসাহ দিতে হবে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া যাতে দরকার নিয়মানুবর্তিতা এবং অসীম ধৈর্য। মানব জীবনে আদব বা শিষ্টাচার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আদর্শ ও সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনে শিষ্টাচারের গুরুত্ব অপরিসীম। উত্তম চরিত্র, ভাল ব্যবহার ও সুসভ্য জাতি গঠনের সর্বোত্তম উপায় ও উপকরণ রয়েছে পবিত্র কুরআন ও হাদীছে নববীতে। আহার-পানীয় গ্রহণে, অন্যের সঙ্গে কুশল বিনিময়ে, সালাম আদান-প্রদানে, অনুমতি গ্রহণে, ওঠাবসা, কথা বলা, আনন্দ ও শোক প্রকাশ প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুমিনের আচরণ কিরূপ হবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে ইসলামে। কোন মুসলিম কাঙ্ক্ষিত মানের ও সুসভ্য মানুষ রূপে গড়ে উঠবে এবং নিজেকে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ভিন্ন বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করতে সক্ষম হবে তখনই, যখন ইসলামী শিষ্টাচারের সুষমাকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও পার্থিব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে ফুটিয়ে তুলতে পারবে। তাই মানব জীবনে শিষ্টাচার অতি গুরুত্বপূর্ণ।

শিষ্টাচারের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূল (সঃ) বলেন, إِنَّ الْهَدْىَ الصَّالِحَ، وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ، وَالاِقْتِصَادَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّة - ‘নিশ্চয়ই উত্তম চরিত্র, ভাল ব্যবহার ও পরিমিত ব্যয় বা মধ্যপন্থা অবলম্বন করা নবুয়তের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ’।

কুরআনের আলোকে শিষ্টাচার : শিষ্টাচারের বিভিন্ন দিক কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। শিষ্টাচারের শিক্ষা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ, ‘তুমি ক্ষমার নীতি গ্রহণ কর। লোকদের সৎকাজের আদেশ দাও এবং মূর্খদের এড়িয়ে চল’ *(আ‘রাফ ৭/১৯৯)*।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ আরো বলেন,

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيْمٍ-

‘ভাল ও মন্দ কখনো সমান হ’তে পারে না। তুমি উত্তম দ্বারা (অনুত্তমকে) প্রতিহত কর। ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে যেন (তোমার) অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে। এই গুণের অধিকারী কেবল তারাই হ’তে পারে, যারা ধৈর্যধারণ করে এবং এই গুণের অধিকারী কেবল তারাই হ’তে পারে, যারা মহা ভাগ্যবান’ *(ফুছছিলাত/হামিম সাজদাহ ৪১/৩৪-৩৫)*। মুমিনদের প্রশংসায় আল্লাহ আরো বলেন

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ, - ‘যারা সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা সর্বাবস্থায় (আল্লাহর রাস্তায়) ব্যয় করে, যারা ক্রোধ দমন করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন’ *(আলে ইমরান ৩/১৩৪)*।

ইসলামী শিষ্টাচারের কতিপয় দিক :

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এতে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের নিদের্শনা নিহিত আছে। শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত জীবনের সকল সমস্যার সুষ্ঠু-সুন্দর সমাধান রয়েছে ইসলামে। নিম্নে কিছু দিক উল্লেখ করা হ’ল, যেগুলো নিজেদের মধ্যে গড়ে উঠালে সন্তানও সেভাবে শিক্ষা নিবে:-

সালাম বা সম্ভাষণ : শিষ্টাচার সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে সর্বাগ্রে আসে পারস্পরিক সম্ভাষণের বিষয়টি। এই সালামের ব্যাপারে প্রত্যেককে অগ্রণী হ’তে হবে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে সালামের উত্তর দিতে হবে। ইসলামে পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[13] সম্ভবপর মুছাফাহা করা এবং কুশল বিনিময় করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَام ‘যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম দেয়, আল্লাহর নিকট লোকদের মধ্যে সেই উত্তম’।[14]

উপহার-উপঢৌকন : হাদিয়া বা উপহার আদান-প্রদান করা শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। এতে পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি-সদ্ভাব গড়ে ওঠে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَهَادُوْا تَحَابُّوْا 'তোমরা একে অপরকে উপঢৌকন দাও এবং ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হও'।[15]

দৈনন্দিন কর্মকান্ড : মানুষের সাথে ওঠা-বসা, পানাহার, বসবাস ও সহাবস্থান সমাজ জীবনের মৌলিক কাজ। এসব প্রাত্যহিক কর্মকান্ডে শিষ্টাচারের প্রমাণ পাওয়া যায় রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনচরিতে। যেমন হাঁচি দেওয়া ও হাই তোলার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بِهَا صَوْتَهُ- 'যখন নবী করীম (ছাঃ) হাঁচি দিতেন, তিনি তাঁর মুখমন্ডলে হাত বা কাপড় দ্বারা আবৃত করতেন এবং তদ্বারা তাঁর স্বর বন্ধ করতেন'।[16] বিকট আওয়াজে অট্টহাসি হাসা, চিৎকার ও হৈ হুল্লোড় ইত্যাদি করা কোন শালীন মানুষের কাজ নয়। পক্ষান্তরে মৃদু বা মুচকি হাসি অপরের মনে বিরক্তির উদ্রেক করে না। বরং আনন্দ দেয় ও ভালোবাসা পয়দা করে। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ- 'আমি রাসূল (ছাঃ)-কে অট্টহাসি করতে দেখিনি, যাতে তাঁর জিহবার তালু দেখা যায়। তিনি মৃদু হাসতেন'।[17]

পরিপাটি থাকা : ইসলাম মানুষকে সদা পরিপাটি থাকতে শিখায়। আতা বিন ইয়াসার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ أَنْ اخْرُجْ كَأَنَّهُ يَعْنِي إِصْلَاحَ شَعَرِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ فَفَعَلَ الرَّجُلُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ-

'রাসূল (ছাঃ) মসজিদে অবস্থানকালে একটি লোক মাথা ও দাড়ির কেশ অবিন্যস্ত অবস্থায় সেখানে প্রবেশ করল। রাসূল (ছাঃ) হাত দ্বারা তার দিকে ইশারা করলেন যেন সে তার মাথা ও দাড়ির কেশ বিন্যাস করে। সে ব্যক্তি তা করে ফিরে এলো। রাসূল (ছাঃ) বললেন, শয়তানের মতো তোমাদের কোন ব্যক্তির এলোকেশে আসার চেয়ে এটা কি উত্তম নয়?[18]

পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা : পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা শিষ্টাচারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ বলেন,إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালবাসেন ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ- 'সেখানে এমন সব লোক রয়েছে, যারা উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হওয়াকে ভালবাসে। বস্ত্ততঃ আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন' *(তওবা ৯/১০৮)*।

লাজুকতা : লজ্জাশীলতা সভ্যতা ও মার্জিত রুচির পরিচায়ক। রাসূল (ছাঃ) ছিলেন লজ্জাশীলতার মূর্ত প্রতীক। তিনি বলেন, الْحَيَاءُ مِنَ الإِيْمَانِ 'লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ'।[19]

জনসাধারণের সাথে উত্তম ব্যবহার : জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার সাথে সুন্দর আচরণ করা ও ভাল কথা বলা, ভদ্র ও মার্জিত রুচির পরিচায়ক। সদাচরণ মানুষকে কাছে টানে। সদাচরণের বাস্তব উদাহরণ ছিলেন নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। এ ব্যাপারে আল্লাহর ঘোষণা, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ- 'আর আল্লাহর রহমতেই তুমি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমলহৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী ও কঠোর হৃদয়ের হ'তে তাহ'লে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

হাসিমুখে কথা বলা ও রাগ না করা : মানুষের সাথে হাসিমুখে কথা বলা উচিত। রাসূল (ছাঃ) সর্বদা মানুষের সাথে হাসিমুখে কথা বলতেন।[27] একজন হাস্যোজ্জ্বল মানুষের সাথে যে কেউ কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। সেই সাথে রাগ পরিহার করবে। কেননা ক্রোধান্বিত হয়ে মানুষ অধিক ভুল করে থাকে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِى. قَالَ لاَ تَغْضَبْ. فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ لاَ تَغْضَبْ. 'জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আরয করল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, তুমি রাগ করো না। লোকটি কয়েকবার কথাটা পুনরাবৃত্তি করলে নবী করীম (ছাঃ) প্রত্যেকবারই বললেন, রাগ করো না'।[28]

সুন্দর কথা বলা : পৃথিবীতে যত আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা সুন্দর কথা দিয়েই হয়েছে। অসুন্দর কথা ও খারাপ ভাষা প্রয়োগ করে কোন আদর্শ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ভাল কথা দিয়ে সহজেই মানুষের মন জয় করা যায়। শ্রেষ্ঠ মনীষীরা সুভাষী ছিলেন। একটি সুন্দর কথা ভালো গাছের মতো, মাটিতে যার শিকড় বদ্ধমূল, আকাশে যার শাখা বিস্তৃত, যে গাছ অফুরন্ত ফল দান করে। তাই সুস্পষ্ট ভাষায় সুন্দরভাবে কথা বলতে হবে।

প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করা : প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ ও ভাল ব্যবহার করা একজন মুসলমানের অন্যতম কর্তব্য। সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা ও সদ্ভাব বজায় রাখা অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللهَ وَرَسُولَهُ، أَوْ يُحِبَّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا ائْتُمِنَ، وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَه- 'যে ব্যক্তি এটা পসন্দ করে যে, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল তাকে ভালোবাসুক, সে যেন কথা বললে সত্য বলে, আমানত রাখা হলে তা পূর্ণ করে এবং স্বীয় প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করে'।[29] রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,مَا زَالَ يُوصِينِى جِبْرِيلُ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُه 'জিবরীল আমাকে প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করার জন্য এত বেশী উপদেশ দিতে থাকেন যে, আমি ভেবেছিলাম হয়তো প্রতিবেশীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে দিবেন'।[30] তিনি আরো বলেন, لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ: يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِد- 'এক মুমিনের উপর অপর মুমিনের ছয়টি অধিকার রয়েছে। যথা- অসুস্থ হ'লে তাকে দেখতে যাওয়া, মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করা, দাওয়াত দিলে তা কবুল করা, সাক্ষাৎ হ'লে তাকে সালাম দেওয়া, হাঁচি দিলে জবাব দেওয়া এবং উপস্থিতিতে ও অনুপস্থিতিতে তার কল্যাণ কামনা করা'।[31]

পারস্পরিক দোষ-ত্রুটি সংশোধন করে দেওয়া : কোন লোকের মধ্যে দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হ'লে সংশোধনের উদ্দেশ্যে তাকে ব্যক্তিগতভাবে বলতে হবে। যাতে সে সংশোধন হয়ে যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِه- 'এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য

আয়না স্বরূপ। এক মুমিন অপর মুমিনের ভাই। তারা একে অপরকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করে এবং তার অনুপস্থিতিতে তাকে রক্ষা করে’।[32]

কু-ধারণা না করা : অন্য মুসলিম ভাইয়ের প্রতি সুধারণা পোষণ করতে হবে। তার প্রতি অযথা কু-ধারণা পোষণ করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। কেননা কোন কোন ধারণা পাপ’ *(হুজুরাত ৪৯/১২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا- ‘তোমরা অনুমান করা থেকে সাবধান হও। কেননা অনুমান অবশ্যই সর্বাপেক্ষা বড় মিথ্যা। আর তোমরা অন্যের দোষ অন্বেষণ করো না, গুপ্তচরবৃত্তি করো না, পরস্পরের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করো না এবং পরস্পরের সাথে হিংসা করো না। পরস্পরের ক্ষতি করার জন্য পেছনে লেগে থেকো না। আর তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হয়ে যাও’।[33]

সবার জন্য কল্যাণ কামনা করা : এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য কল্যাণ কামনা করবে। আল্লাহ বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ-

‘তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব, তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে’ *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। এখানে একজন মুসলমানকে সকল মানুষের কল্যাণ কামনার জন্য বলা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِم- ‘সদুপদেশ দেয়াই দ্বীন। আমরা আরয করলাম, কার জন্য উপদেশ? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের, মুসলিম শাসক এবং মুসলিম জনগণের’।[34] সুতরাং মানুষের কল্যাণ কামনায় তাকে উপদেশ দিতে হবে।

উত্তম মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সুন্দর। সেই পূর্ণ মুসলমান যার আচরণ সর্বোত্তম। যে ব্যক্তি লেনদেন ও কাজ-কারবারে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত, ওয়াদা পূর্ণ করে ও দায়িত্ব পালন করে; মানুষকে ধোঁকা দেয় না, আমানতের খেয়ানত করে

না, মানুষের হক নষ্ট করে না, ওযনে কম দেয় না, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং সূদ-ঘুষসহ যাবতীয় অবৈধ উপার্জন থেকে বিরত থাকে, সেই প্রকৃত মুসলমান। খাঁটি মুসলিম সেই ব্যক্তি যার জিহবা ও হাত থেকে অপর মানুষ নিরাপদে থাকে। কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্যে যা পছন্দ করে তার ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করবে।

হাদীসে এসেছে - রাসূল (স) বলেছেন,

" সন্তানের প্রতি বাবা-মায়ের সর্বোৎকৃষ্ট উপহার হল - মার্জিত ব্যবহার ও উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষাদান "

(জামি তিরমিযী : ১৯৫২)

কন্যা সন্তান লালন-পালনঃ

হজরত আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنّ كُنّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النّارِ

'যে ব্যক্তিকে কন্যা সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এবং সে ধৈর্যের সঙ্গে তা সম্পাদন করেছে, সেই কন্যা সন্তান তার জন্য জাহান্নাম থেকে আড়াল হবে। (জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯১৩)

জান্নাতে প্রবেশ করার মাধ্যমও হলো কন্যা সন্তানের লালন-পালন করা। আবার জাহান্নাম থেকেও মুক্তি মিলবে কন্যা সন্তানের উত্তমরূপে প্রতিপালন করার দ্বারা। এর চেয়ে বড় আরেকটি ফজিলত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আনাস রাযিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الْجَنّةَ كَهَاتَيْنِ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ

'যে ব্যক্তি দু'জন কন্যা সন্তানকে লালন-পালন ও দেখাশুনা করলো (বিয়ের সময় হলে ভালো পাত্রের কাছে বিবাহ দিল) সে এবং আমি জান্নাতে এরূপ একসঙ্গে প্রবেশ করব যেরূপ এ দু'টি আঙুল। তিনি নিজের দুই আঙুল মিলিয়ে দেখালেন।

(জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯১৪)

কন্যা সন্তান প্রতিপালনের তিনটি ফজিলত:

এক. আল্লাহ জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন।

দুই. জান্নাত দান করবেন।

তিন. আল্লাহ তাকে জান্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য দান করবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ তিনটি ফজিলত বর্ণনা করেছেন কন্যা সন্তান লালন-পালনকারীদের জন্য।

কন্যা সন্তানের জন্মে অধিক আনন্দ প্রকাশ করা:

কন্যা সন্তান জন্ম নিলে আনন্দ প্রকাশ করা; তাইতো কন্যা জন্মের সংবাদকে ‘সুসংবাদ’ বলে অভিহিত করা হয়েছে ইসলামে। আর সুসংবাদ শুনে মানুষ আনন্দই প্রকাশ করে।

এজন্য অনেক উলামায়ে কেরাম লেখেন, যেহেতু কন্যা সন্তান জন্মানোর কারণে নিজেকে ছোট মনে করা, একে অপমান ও অসম্মানের কারণ মনে করা কাফিদের কর্মপন্থা, তাই মুসলমানগণের উচিত, তারা কন্যা সন্তানের জন্মের কারণে অধিক খুশি ও আনন্দ প্রকাশ করবে। যাতে কাফিরদের এ নিচু রীতির প্রতিবাদ হয় এবং এ রীতি যেন বিলুপ্ত হয়ে যায়।

কন্যা সন্তানের হকসমূহ:

জাহেলী যুগে এ হকসমূহ থেকে কন্যা সন্তানকে বঞ্চিত করা হত। আজকালও তাদের হকসমূহ আদায়ের ব্যাপারে অবহেলা করা হয় অনেক জায়গায়। এজন্য তাদের হকগুলো বুঝে নেয়া জরুরি। যেন এ ব্যাপারে আমাদের অবহেলা না হয়। ভালোবাসা প্রকাশের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা। কারো পুত্র সন্তানের প্রতি ভালোবাসা বেশি আবার কারো কন্যা সন্তানের প্রতি এমন যেন না হয়। অধিকাংশ লোকের পুত্র সন্তানের তুলনায় কন্যা সন্তানের প্রতি ভালোবাসা কম থাকে। ভালোবাসা ও মোহাব্বাতের সম্পর্ক হলো অন্তরের সঙ্গে। এতে মানুষের ইচ্ছার দখল নেই। এজন্য এ ক্ষেত্রে সমতা রক্ষার বিষয়ে মানুষ বাধ্যও নয়। তবে ভালোবাসা প্রকাশ মানুষের ইচ্ছার অধীন। এ ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা আবশ্যক।

সন্তান লালন পালনে ইসলামের নির্দেশনা

একুশে জার্নাল

সেপ্টেম্বর ০২ ২০২০, ২২:২০

মুফতি আহমদ যাকারিয়া

মানবকাননের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত ও সুরভিত পুষ্প হচ্ছে শিশু। সংসারজীবনের আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ—সব কিছু আবর্তিত হয় শিশুকে কেন্দ্র করে। শিশুর হাসি যেমন মায়ের যাবতীয় দুঃখ দূর করে দেয়, তেমনি অনুপ্রাণিত করে বাবাকে সংসারযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে। প্রতিটি শিশুই ছোট্ট চারাগাছের মতো, ফুলের কলির মতো। তার মধ্যে রয়েছে বিশাল বৃক্ষ হয়ে বিকশিত হওয়ার যোগ্যতা। সুন্দর ফুল হয়ে ফুটে ওঠার সক্ষমতা। ঘ্রাণে ঘ্রাণে পৃথিবীকে সুবাসিত করার সুপ্ত প্রতিভা।

শেখালেই শিশুরা শেখে : শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। তারা দেখে দেখে শেখে। শুনে শুনে শেখে। প্রয়োজন শুধু বড়দের সচেতনতা। শিশু তার বাবার কাছ থেকে শেখে। মায়ের কাছ থেকে শেখে। শিক্ষকের কাছ থেকে শেখে। তার চারপাশের মানুষের কাছ থেকে সে শিখতে থাকে। ফলে সবাইকে শিশুর সামনে সচেতনভাবে চলাফেরা করতে হবে। শিশুকে বলা হয় ‘কাদামাটি’। আপনি যেভাবে তাকে গড়তে চাইবেন, সেভাবে সে গড়ে উঠবে। যা শেখাবেন তা-ই শিখবে।

আল্লাহতায়ালা মানবশিশুকে নিষ্পাপ এবং ভবিষ্যৎ সফলতার যাবতীয় উপকরণ সন্নিহিত করে দুনিয়ায় পাঠান। সৃষ্টিগত কোনো যোগ্যতা শিশু তার মায়ের পেট থেকে নিয়ে আসে না। বরং পৃথিবী নামক এ বিশাল গর্ভে দৃষ্টি মেলার পর তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, মা-বাবা, সমাজ-সংসার ও শিক্ষালয় থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা-দীক্ষা তার ভবিষ্যৎ জীবনের গতিপথ নির্ণয় করে দেয়। নিষ্পাপ শিশুকে ইসলাম যেমন স্নেহ-মমতা দিয়ে গড়ার আদেশ করেছে, তদ্রূপ ভবিষ্যতে সুন্দর নাগরিক ও পরকালীন উপযুক্ত পাথেয় হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাকে শৃঙ্খলা ও আন্তরিক শাসনের মধ্যে আটকে রাখারও নির্দেশ করেছে।

আজকাল যুবকদের মধ্যে ধর্মহীনতার বড় কারণ এই যে, পিতা-মাতা ধর্মজ্ঞানে জ্ঞানী ও ধার্মিক হলেও সন্তানদের ধার্মিক হওয়ার বিষয়ে হয়তো সেভাবে চিন্তা

করে না। সাধারণভাবে আমাদের দৃষ্টি সন্তানদের পার্থিব ও স্বল্পকালীন আরাম-আয়েশের প্রতিই নিবদ্ধ থাকে এবং আমরা এর ব্যবস্থাপনায়ই ব্যতিব্যস্ত থাকি। অক্ষয় ধন-সম্পদের দিকে মনোযোগ দেই-ই না। আমাদের উচিত আখেরাতের চিন্তায় ব্যাপৃত হয়ে নিজের ও সন্তানদের জন্য ঈমান ও নেক আমলকে সর্ববৃহৎ পুঁজি মনে করে তা অর্জনে সচেষ্ট হওয়া।

সন্তান চারিত্রিক হওয়া নির্ভর করে পরিবারের সচেতনতার উপর:

পারিবারিক জীবনে সন্তান লালন-পালনে বাবা-মায়ের দায়িত্ব অপরিসীম। মাতা-পিতার কারণেই শিশু ইহজগতের মুখ দেখতে পেরেছে। সন্তান জন্মের পরই মা সর্বপ্রথম তাঁর শিশুটিকে মাতৃদুগ্ধপানে আগলে রাখেন। মমতাময়ী মায়ের কারণেই সন্তানের পৃথিবীর আলো দেখার সৌভাগ্য হয় ও তাঁর উষ্ণক্রোড়ে থেকে বাল্য অবস্থায় অসহায় শিশুটি নিরাপদে বেড়ে ওঠে।

সন্তান গর্ভধারণ, প্রসব বেদনার কষ্ট এবং দুধপান করানো প্রভৃতি সন্তানের মা একাই বহন করে থাকেন। অতঃপর বাবা লালন-পালনের বেলায় মায়ের সঙ্গে অংশীদার হয়ে থাকেন। এর বাহ্যিক বিনিময়স্বরূপ আল্লাহ পাক সন্তানের প্রতি তার মাতা-পিতার সঙ্গে সদয় ও সদ্ব্যবহারকে বাধ্যতামূলক তথা ফরজে আইন করে ঘোষণা দিয়েছেন।

মায়ের সন্তান গর্ভধারণ, প্রসব ও বুকের দুধদানের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে পবিত্র কুরআনে সন্তানকে পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার জন্য আদেশ দিয়ে বলা হয়েছে, 'আমি মানুষকে পিতা-মাতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে গর্ভেধারণ করে কষ্টের সঙ্গে এবং প্রসব করে কষ্টের সঙ্গে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার দুধ ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস।'
(আহকাফ – ১৫)

ছেলে-মেয়েরা মানুষ হওয়াই বাবা-মায়ের জন্য সবচেয়ে বড় প্রতিদান। তাই পিতা-মাতার দায়িত্ব হচ্ছে তাদের লালন-পালন করা, তাদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি অবশ্যই ধর্মীয় শিক্ষাদান ও ইসলামের

আলোকে নৈতিক চরিত্র গঠনে অপরিহার্যভাবে গুরুত্বারোপ। পারিবারিক পরিবেশে শিশুরা বড় হতে থাকবে এবং ধর্মীয় মূল্যবোধও তাদের হৃদয়ে জাগ্রত হবে।

এ কারণেই নবী সা. বলেছেন, 'যখন তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হয় তখন তাদের নামাজের প্রশিক্ষণ দাও।'

হাদিসে বলা হয়েছে, 'সুন্দর নৈতিক চরিত্র ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার চেয়ে উত্তম কিছুই পিতা-মাতা সন্তানদের দান করতে পারে না।' (তিরমিজি)

মুসলিম সমাজে পরিবার এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে সন্তান জন্মদান ও প্রতিপালন করে এবং আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব পালন করে। ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার হলো একটি শিশুর জীবন গড়ার প্রাথমিক পাঠশালা ও প্রধান পাঠাগার। এ পাঠশালার ওপর শিশুর জীবনের ভিত রচিত হয়। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বসবাসের মধ্য দিয়েই শিশুরা মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রচনার গুণাগুণের পরিচয় লাভ করতে শুরু করে। এ জন্য পরিবারের প্রধান দু'জন সদস্য বাবা-মায়ের ভূমিকা অপরিসীম। সন্তান পিতা-মাতার অতিশয় প্রিয়জন। তারা বাবা-মায়ের প্রতি অনুগত ও বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে এটাই স্বাভাবিক। শিশুরা খুবই অনুকরণপ্রিয়; তারা যা শোনে, যা দেখে, তা-ই বলে এবং তা-ই করে। তাদের সামনে অশোভনীয় কিছু বলা বা করা মোটেই সমীচীন নয়। তাদের স্নেহ, আদর ও সুন্দর আচরণ শেখানো জরুরি। এতে তারা আদব-কায়দা ও ভালো কথা বলতে শিখবে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সা. বলেন; 'যে ছোটকে স্নেহ-মমতা করে না এবং বড়কে শ্রদ্ধা করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।' (বুখারি)

সন্তান চারিত্রিক হতে হলে বাবা-মা সচেতন হতে হবে:

প্রতিটি মানুষই বিবাহিত জীবনে প্রবেশের পর সন্তান কামনা করেন। অধিকাংশ দম্পতিই হন সন্তানের গর্বিত পিতা-মাতা। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, শুধু সন্তান জন্ম দিয়ে পিতা-মাতা হওয়াই যথেষ্ট নয়। সাথে সাথে সবাইকে হতে হবে দায়িত্বশীল পিতা-মাতা। অন্যথায় দুনিয়াতে যেমন রয়েছে ভোগান্তি, আখিরাতেও রয়েছে তেমনি অশান্তি এবং অপেক্ষমান নিচ্ছিদ্র জবাবদিহিতা। কারণ, সন্তান হলো পিতা-মাতার কাছে প্রদত্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

»كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.«

'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর সবাই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে। ইমাম একজন দায়িত্বশীল; তিনি তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ দায়িত্বশীল তার পরিবারের; সে জিজ্ঞাসিত হবে তার দায়িত্ব সম্পর্কে। মহিলা দায়িত্বশীল তার স্বামীর গৃহের (তার সম্পদ ও সন্তানের); সে জিজ্ঞাসিত হবে তার দায়িত্ব সম্পর্কে। ভৃত্যও একজন দায়িত্বশীল, সে জিজ্ঞাসিত হবে তার মুনিবের সম্পদ সম্পর্কে। (এক কথায়) তোমরা সবাই দায়িত্বশীল, আর সবাই জিজ্ঞাসিত হবে সে দায়িত্ব সম্পর্কে।'
(বুখারী:৭১৩৮; তিরমিযী : ১৭০৫)

অনেক পিতা-মাতাই কিন্তু সন্তানের প্রতি যথাযথ দায়িত্ববান নই। আরও বাস্তব কথা হলো, আমরা নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল-ই নই। কেউ হয়তো প্রিয় এই সন্তানদের স্রষ্টা আল্লাহর হুকুম মতো জীবন পরিচালনাই করি না আর যারা করি, তারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে অবগত-ই নই।

তাই দেখা যায়, সমাজের মধ্যে শুধু সন্তানের দৈহিক চাহিদার তত্ত্বাবধান করা হয়। তার আত্মিক চাহিদার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ-ই করা হয় না। অথচ এর গুরুত্ব প্রথমোক্তটির চেয়ে বেশি বৈ কম নয়। দৈহিক চাহিদাকে পরিতৃপ্তি দিতে

পারে কেবল আত্মা। পক্ষান্তরে দৈহিক চাহিদার অপূর্ণতা সত্ত্বেও আত্মা পারে সুখী হতে।

ইসলাম তাই শিশুর উভয় চাহিদার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। পিতা-মাতাকে উভয় দিক তত্ত্বাবধান করতে নির্দেশনা প্রদান করেছে। সন্তানকে আত্মিকভাবে ঋদ্ধ ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করার ইঙ্গিত পাই আমরা আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ﴾ [التحريم:

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর।’ (তাহরীম : ০৬)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘অর্থাৎ, তাদেরকে আদব শিক্ষা দাও এবং ইলম শেখাও।’

(তাফসীর ইবন কাসীর, উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

এদিকে বৈষয়িক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় তথা নৈতিক শিক্ষাদানের প্রতি গুরুত্বারোপ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ.»

‘তোমাদের সন্তানদের সাত বছর হলে তাদেরকে নামাজের নির্দেশ দাও, তাদের বয়স দশ বছর হলে এ জন্য তাদেরকে প্রহার করো এবং তাদের পরস্পরের বিছানা পৃথক করে দাও।’

(আবূ দাউদ: ৪৯৫; মুসনাদ আহমদ: ৬৬৮৯)

ইমাম গাজালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

اعلم أن الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمور وأوكدها، والصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة خالية عن كل نقش وصورة، وهو قابل لكل مانقش ومائل إلى كل مايمال إليه، فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبوه وكل معلمٍ له ومؤدب، وإن عوِد الشر وأهمل إهمال البهائم شقى وهلك وكان الوزر في رقبة القيِم عليه والوالي له..،

‘জেনে রাখ, শিশু প্রতিপালন পদ্ধতি একটি অতি গুরত্বপূর্ণ বিষয়। আর সন্তান তার পিতা-মাতার কাছে আমানত স্বরূপ। তার পবিত্র অন্তর অমূল্য মাণিক্য, যেকোন নকশা বা ছবি থেকে যা মুক্ত। ফলে তা যেকোন নকশা গ্রহণে প্রস্তুত

এবং তাকে যার প্রতিই ধাবিত করা হবে সে দিকেই সে ধাবিত হয়। তাই তাকে ভালোয় অভ্যস্ত করা হলে, সু-শিক্ষায় প্রতিপালন করলে, সেভাবেই সে গড়ে উঠবে। ইহকালে ও পরকালে সে সুখী হবে। তার নেকীতে তার পিতা-মাতা এবং তার প্রত্যেক শিক্ষক ও শিষ্টাচারদানকারীই অংশীদার হবেন। পক্ষান্তরে তাকে খারাপে অভ্যস্ত করা হলে, তাকে পশুর ন্যায় অবহেলা করা হলে, সে হবে হতভাগ্য ও ধ্বংসপ্রাপ্ত। আর এর দায় বর্তাবে তার কর্তা ও অভিভাবকের ওপর।'

(ইহয়াউ উলুমিদ্দীন:৩/৬২)

সন্তানকে রক্ষা করার উপায় হলো, তার পিতা-মাতা তাকে শিষ্টাচার সম্পন্ন, সভ্য ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী বানাবে এবং তাকে অসৎ সঙ্গ থেকে বিরত রাখবে। তার মাঝে বুদ্ধির উন্মেষ লক্ষ্য করা মাত্র উত্তমরূপে তাকে পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করতে শুরু করবে। বুদ্ধির এ উন্মেষের সূচনা লাজুকতার প্রাথমিক প্রকাশের মাধ্যমে। কারণ, যখন সে লজ্জা পায়, সলাজ হয় এবং কোনো কিছু বর্জন করে, তা কেবল তার উপর জ্ঞানের আলো পড়ার কারণেই করে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এটি তার জন্য একটি উপহার এবং সুসংবাদতুল্য, যা স্বভাবের সুস্থতা ও হৃদয়ের স্বচ্ছতা প্রমাণ করে। এটি পরিণত বয়সে তার বুদ্ধির পূর্ণতারও ইঙ্গিত প্রদান করে।

সুতরাং শিশুর লাজুকতাকে উপেক্ষা করা সমীচীন নয়। বরং তাকে সু-শিক্ষিত ও মার্জিতভাবে গড়ে তুলতে এ লাজুকতা ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগানো উচিত। প্রতিপালনের প্রাথমিক অবস্থায় যদি শিশুর প্রতি অযত্ন ও অনাদর দেখানো হয়, তবে প্রায় ক্ষেত্রেই সে অসৎ স্বভাব নিয়ে বেড়ে ওঠে। মিথ্যুক, হিংসুক, নিন্দুক ও তস্কর হিসেবে এবং অনর্থক কথা, অট্টহাসি, কূটচাল ও অশ্লীল আচরণে অভ্যস্ত হয়ে বড় হয়। শিশুকে এসব বদ অভ্যাস থেকে বাঁচানো সম্ভব আদব ও শিষ্টাচার শেখানোর মাধ্যমে। তাকে পাঠাতে হবে দীনী শিক্ষালয়ে। সেখানে সে কুরআন-হাদীস শিখবে। মনীষীদের শিক্ষণীয় ঘটনাবলী ও জীবনালেখ্য সম্পর্কে জানবে। এতে করে তার কচি মনে মনীষীদের প্রতি শ্রদ্ধা জন্ম নেবে।

ভাগ্যবানদের আল্লাহ উপহার দেন কন্যা সন্তান:

কন্যা সন্তান মাতা-পিতার জন্য একটি শ্রেষ্ট নেয়ামত। কন্যা সন্তানকে অশুভ মনে করা কাফিরদের স্বভাব। কন্যা সন্তানকে অপছন্দ করা খাঁটি মুমিনের পরিচায়ক নয়। কন্যা সন্তান অশুভ নয়, অকল্যানকর নয়। বরং কন্যা সন্তান জন্ম নেয়া সৌভাগ্যের নিদর্শন।

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, 'যার গৃহে কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহন করলো, অতঃপর সে তাকে (কন্যাকে) কষ্টও দেয়নি, তার উপর অসন্তুষ্টও হয়নি এবং পুত্র সন্তানকে প্রাধান্য দেয়নি, তাহলে ওই কন্যার কারণে আল্লাহ তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।'

(মুসনাদে আহমদ, ১:২২৩)

এই বর্ণনা দ্বারা প্রমানিত হয় যে, কন্যা সন্তান মহান আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত। সুতারাং কন্যা সন্তানকে বেশি করে ভালোবাসুন। আদর-সোহাগ করুন আর মায়া-মমতা দিয়ে লালন-পালন করুন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি আরো বলেন;

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلاَثُ أَخَوَاتٍ أَوِ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللهَ فِيهِنَّ فَلَهُ الجَنَّةُ.

'যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান বা তিনজন বোন আছে অথবা দু'জন কন্যা সন্তান বা বোন আছে। সে তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছে এবং তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করেছে। তার জন্য রয়েছে জান্নাত।'

(জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯১৬)

এ ফজিলতের কথা পুত্র সন্তানের বেলায় বলা হয়নি। বরং কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। এজন্য আমাদের উচিত কন্যা সন্তানের লালন-পালন সন্তুষ্টচিত্তে করা।

সন্তান লালন পালনের ফজিলত:

ছেলে ও মেয়েতে বৈষম্য না করা উচিত। উভয়েই কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত স্বরূপ। সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে—তার জন্মে আনন্দ প্রকাশ করা মা-বাবার জন্য ঈমানের পরিচায়ক। আল্লাহ ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্মকে কোরআনে সুসংবাদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইয়াহইয়া আ. সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে,

'হে জাকারিয়া! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি। তার নাম ইয়াহইয়া। এই নাম আগে কারো রাখা হয়নি।'

(মারিয়াম: ৭)

ছেলে জন্মের খবর যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ, মেয়ে জন্মের সংবাদও আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ। যারা এই সুসংবাদে সন্তুষ্ট হতে পারে না, মনে মনে ব্যথিত হয়, আল্লাহ তাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'যখন তাদের কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, মনঃকষ্টে তাদের চেহারা কালো হয়ে যায়। তাদের যে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে; তার কারণে তারা নিজ সম্প্রদায়ের লোক থেকে মুখ লুকিয়ে রাখে। তারা ভাবে, এই সন্তান রাখবে, নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! তাদের সিদ্ধান্ত কতই না নিকৃষ্ট। (নাহল: ৫৮-৫৯)

অন্য আয়াতে আল্লাহ কন্যাসন্তানের মা-বাবাকে এই সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, 'অনেক পুরুষ নারীর সমকক্ষ নয়।' (মারিয়াম: ৩৬)

অর্থাৎ তোমাদের যে কন্যাসন্তান দান করা হয়েছে, তা অনেক পুরুষের তুলনায় উত্তম হতে পারে। অনেক পুরুষ অনেক নারীর তুলনায় অধমও হয়। রাসুলুল্লাহ সা. ছেলে-মেয়ে-নির্বিশেষে সবার প্রতি ন্যায়ানুগ আচরণ করতে বলেছেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহকে ভয় করো, সন্তানদের ভেতর সুবিচার প্রতিষ্ঠা করো।'

(বুখারি: ২৫৮৭)

কন্যা সন্তান জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়:

হজরত আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنَ البَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنّ كُنّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النّارِ

'যে ব্যক্তিকে কন্যা সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এবং সে ধৈর্যের সঙ্গে তা সম্পাদন করেছে, সেই কন্যা সন্তান তার জন্য জাহান্নাম থেকে আড়াল হবে।

(জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯১৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হওয়া:

জান্নাতে প্রবেশ করার মাধ্যমও হলো কন্যা সন্তানের লালন-পালন করা। আবার জাহান্নাম থেকেও মুক্তি মিলবে কন্যা সন্তানের উত্তমরূপে প্রতিপালন করার দ্বারা। এর চেয়ে বড় আরেকটি ফজিলত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আনাস রাযিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الجَنّةَ كَهَاتَيْنِ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ

'যে ব্যক্তি দু'জন কন্যা সন্তানকে লালন-পালন ও দেখাশুনা করলো (বিয়ের সময় হলে ভালো পাত্রের কাছে বিবাহ দিল) সে এবং আমি জান্নাতে এরূপ একসঙ্গে প্রবেশ করব যেরূপ এ দু'টি আঙুল। তিনি নিজের দুই আঙুল মিলিয়ে দেখালেন।

(জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯১৪)

কন্যা সন্তান প্রতিপালনের তিনটি ফজিলত:

এক. আল্লাহ জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন।

দুই. জান্নাত দান করবেন।

তিন. আল্লাহ তাকে জান্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য দান করবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ তিনটি ফজিলত বর্ণনা করেছেন কন্যা সন্তান লালন-পালনকারীদের জন্য।

কন্যা সন্তানের জন্মে অধিক আনন্দ প্রকাশ করা:

কন্যা সন্তান জন্ম নিলে আনন্দ প্রকাশ করা; তাইতো কন্যা জন্মের সংবাদকে ‘সুসংবাদ’ বলে অভিহিত করা হয়েছে ইসলামে। আর সুসংবাদ শুনে মানুষ আনন্দই প্রকাশ করে।

এজন্য অনেক উলামায়ে কেরাম লেখেন, যেহেতু কন্যা সন্তান জন্মানোর কারণে নিজেকে ছোট মনে করা, একে অপমান ও অসম্মানের কারণ মনে করা কাফিদের কর্মপন্থা, তাই মুসলমানগণের উচিত, তারা কন্যা সন্তানের জন্মের কারণে অধিক খুশি ও আনন্দ প্রকাশ করবে। যাতে কাফিরদের এ নিচু রীতির প্রতিবাদ হয় এবং এ রীতি যেন বিলুপ্ত হয়ে যায়।

কন্যা সন্তানের হকসমূহ:

জাহেলী যুগে এ হকসমূহ থেকে কন্যা সন্তানকে বঞ্চিত করা হত। আজকালও তাদের হকসমূহ আদায়ের ব্যাপারে অবহেলা করা হয় অনেক জায়গায়। এজন্য তাদের হকগুলো বুঝে নেয়া জরুরি। যেন এ ব্যাপারে আমাদের অবহেলা না হয়। ভালোবাসা প্রকাশের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা। কারো পুত্র সন্তানের প্রতি ভালোবাসা বেশি আবার কারো কন্যা সন্তানের প্রতি এমন যেন না হয়।

অধিকাংশ লোকের পুত্র সন্তানের তুলনায় কন্যা সন্তানের প্রতি ভালোবাসা কম থাকে। ভালোবাসা ও মোহাব্বাতের সম্পর্ক হলো অন্তরের সঙ্গে। এতে মানুষের ইচ্ছার দখল নেই। এজন্য এ ক্ষেত্রে সমতা রক্ষার বিষয়ে মানুষ বাধ্যও নয়। তবে ভালোবাসা প্রকাশ মানুষের ইচ্ছার অধীন। এ ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা আবশ্যক।

সন্তান লালন পালনের পদ্ধতি:

শিশুকে অহেতুক বিষয় শেখানো উচিত নয় :

অনেক মা-ই শিশুর মূল্যবান সময়কে অহেতুক কাজের মধ্যেই পার করে দেন। যখন তাকে কালিমা শেখানো দরকার, তখন শিক্ষা দেওয়া হয় হাট্টি মা টিম টিম...।'

আর এসব নিয়ে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েন, যেন শিশুর প্রতি এগুলোই তাদের কর্তব্য। ফলে সেই শিশু ঈমানি শিক্ষা আর পায় না। আল্লাহর প্রতি তার আস্থা সৃষ্টি হয় না। এমনকি নবীর পরিচয়ও সে জানতে পারে না। আফসোস!

ছোটদের প্রতি কোমল হতে হবে:

বড়দের কাছ থেকে আমরা ভালো ব্যবহার প্রত্যাশা করি। তাহলে ছোটদের প্রতি কেন আমরা তা করি না? আমরা যদি আমাদের ছোটদের সঙ্গে ভালো ও কোমল ব্যবহার করি, তাহলে বড়রাও আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে। নবীজির শিক্ষা হলো, কোমলতা অবলম্বন করো। কঠোরতা পরিহার করো। (মুসলিম: ১৭৩২)

বাস্তবেও কোমলতায় যে ফায়দা হয়, কঠোরতার দ্বারা তা হয় না। সুন্দর করে বুঝিয়ে বললে ছোটরা সব কথাই শোনে। আর ধমক দিয়ে কিছু বললে তারা আরো উল্টো বেঁকে বসে।

রাগান্বিত অবস্থায় প্রহার না করা:

থানভি রহ. বলেন, 'রাগান্বিত অবস্থায় কখনো শিশুকে প্রহার না করা। শাস্তির প্রয়োজন হলে রাগ প্রশমিত হওয়ার পর চিন্তা-ভাবনা করে শাস্তি দেওয়া। মুফতি শফি রহ. বলতেন, অন্যান্য গুনাহ তো তাওবার মাধ্যমে মাফ হতে পারে। কিন্তু শিশুদের উপর জুলুম করা হলে এর ক্ষমা পাওয়া খুবই জটিল। কেননা এটা বান্দার হক। আর বান্দার হক শুধু তাওবার দ্বারা মাফ হয় না। আগে যার হক নষ্ট করা হয়েছে, তার কাছে মাফ চাইতে হয়। শিশুর কাছ থেকে মাফ পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ নাবালেগের ক্ষমা শরিয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি শিশু যদি মুখে বলেও যে আমি মাফ করলাম, তবু তা গ্রহণযোগ্য নয়।

শিশুর ত্রুটি ছোট থেকেই সংশোধন করতে হবে:

শিশুদের ছোট ছোট ত্রুটি, অহংবোধ, অন্যকে কষ্ট দেওয়ার প্রবণতা শৈশবেই সংশোধন করা উচিত। কাউকে গালি দিলে কিংবা কোনো আঘাত করলে সঙ্গে সঙ্গে তার থেকে মাফ চাইয়ে নেওয়াতে হবে। যাতে সে অন্যায়টা বুঝতে পারে এবং তার ভেতরে মাফ চাওয়ার গুণ তৈরি হয়।

মাকে হতে হবে দায়িত্ববান:

শিশুর মনমানসিকতা, ধ্যান-ধারণা, বোধ-বিশ্বাস, রুচিবোধ, শিক্ষা-দীক্ষা, স্বভাব-সভ্যতা, ভদ্রতা তথা ভালো গুণগুলো একজন মা-ই সহজে তাঁর সন্তানের মধ্যে প্রবেশ করাতে পারেন। ইতিহাসের পাতায় আমরা যত মহান ব্যক্তিকে দেখতে পাই, তাঁদের সফলতার পেছনে দেখা যায়, মায়ের অবদান বেশি। মা হলেন সন্তানের জন্য পাঠশালার প্রথম শিক্ষক। তাই মা'কে হতে হবে সন্তানের প্রতিটি ক্ষেত্রে সজাগ ও দায়িত্ববান।

আল্লামা ইকবাল বলতেন যে, বিলাত থেকে ফেরত আসার পরও যখন আল্লাহকে ভুলিনি, তখন আশা করা যায় আর ভুলব না। যখন লোকেরা বলত, ইকবাল! বিলাতের ওই চাকচিক্য দেখেও তুমি কী করে আল্লাহকে স্মরণ রাখতে

পারলে? উত্তরে বলতেন, সেই ছোটকালে আমার মা আমার চোখে যে মুহাম্মদি সুরমা-ইসলামী শিক্ষা লাগিয়ে দিয়েছেন, তার বরকতে এত কিছু সত্ত্বেও আমি আল্লাহকে ভুলিনি।

মা-বাবার কাজের প্রভাব:

মা-বাবার সব কাজের প্রভাব পড়ে সন্তানের উপর। সন্তান যদি বাবাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে গিয়ে জামাতের সঙ্গে আদায় করতে দেখে, তাহলে সন্তানও মসজিদে গিয়ে জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায় করবে। তেমনিভাবে সন্তান যদি মাকে জায়নামাজে দেখে, তাহলে অবুঝ বয়সেও সে মায়ের সঙ্গে নামাজ পড়বে, সেজদা দেবে। মূলত সন্তান শিশুকাল থেকে মা-বাবাকে যেমন দেখবে, নিজের জীবনকে তেমনভাবেই সাজাবে।

গর্ভবতী মায়ের কর্মের প্রভাব:

গর্ভকালীন মায়ের সব কর্মের প্রভাব পড়ে সন্তানের ওপর। মায়ের একটু সচেতনতা দ্বারা সন্তান সুস্থ, সুদর্শন, বুদ্ধিমান, নেককার ও দ্বীনদার হতে পারে। আবার সামান্য একটু অসচেতনতা দ্বারা সন্তান অসুস্থ, ত্রুটিপূর্ণ, দুর্বল, নির্বোধ ও বে-দ্বীন হতে পারে। তাই এ অবস্থায় মা'কে বেশি বেশি নেক আমল করতে হবে। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত নামাজের পাশাপাশি নফল নামাজও পড়তে হবে। রাত্রি জাগরণ বর্জন করতে হবে। সব সময় হাসিখুশি থাকার চেষ্টা করতে হবে। সুযোগ পেলেই কোরআন তিলাওয়াত করতে হবে। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, হাফেজা ও কোরআন তিলাওয়াতকারী মায়ের সন্তান অতিমাত্রায় মেধাবী হয়। একজন নিষ্ঠাবান 'মা' দ্বারা একটি নিষ্ঠাবান জাতিরও জন্ম হয়।

কান্না থামানোর জন্য মিথ্যা না বলা:

শিশুর কান্না থামানোর জন্য বা তার কাছ থেকে কোনো কাজ আদায় করার জন্য মিথ্যা বলা জায়েজ নয়। আবদুল্লাহ ইবনে আমের রা. এর বর্ণনা, একবার আমার আম্মা কিছু একটা দেবেন বলে আমাকে কাছে ডাকলেন। নবীজি সা. তখন আমাদের বাড়িতে বসা ছিলেন। তিনি আমার আম্মাকে বললেন, তুমি কি সত্যিই তাকে কিছু দেবে? আম্মা বললেন, হ্যাঁ! তাকে খেজুর দেওয়ার ইচ্ছা ছিল। নবীজি বললেন, যদি তুমি তাকে কিছু না দিতে তবে তোমার এ কথাটি মিথ্যা বলে গণ্য হতো। (আবু দাউদ: ৪৯৯১)

শিশুর মনে আল্লাহর ভয় তৈরী করা:

শিশুর কচি অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত করে দিতে হবে। মা-বাবা যদি শিশুকে শাসনের ভয় দেখিয়ে বা অন্যরা খারাপ বলবে এই ভয় দেখিয়ে মন্দ অভ্যাস থেকে নিবৃত্ত করতে চান, তবে এটা হবে সাময়িক। মা-বাবার অগোচরে, যেখানে শাসন কিংবা লোকলজ্জার ভয় থাকবে না, সেখানে শিশু দ্বিতীয়বার এ ধরনের কাজে উৎসাহী হতে পারে। কিন্তু যদি তাকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে, এটা পাপ। এমন করলে আল্লাহ নারাজ হবেন। আল্লাহ সব সময় সবাইকে দেখছেন। কোনো কিছুই তার দৃষ্টির আড়ালে নয়। এবং তার অন্তরেও আল্লাহর ভয় বসে যায়, তাহলে শিশুর সব বদ-অভ্যাস স্থায়ীভাবে ঠিক হয়ে যাবে।

মা-বাবার প্রথম কর্তব্য:

শিশু যখন কথা বলতে শুরু করে, তখন তাকে সর্বপ্রথম ‘আল্লাহ’ ও ‘মুহাম্মাদ’; এরপর ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ ও ‘মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ’ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া। কোরআন শিক্ষা দেওয়া। দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি শিক্ষা দেওয়া। মাঝে মধ্যে তাকে নবী-সাহাবা ও মনীষীদের উপদেশমূলক ঘটনা শোনানো। অমার্জিত পোশাক থেকে বিমুখতা সৃষ্টি করা। পাঠশালায় যাওয়ার ব্যাপারে কখনো শিথিলতা প্রদর্শন না করা। সন্তানের সামনে উচ্চস্বরে কথা না বলা। যথাসম্ভব তাকে চোখে চোখে রাখা, যাতে কোনো খারাপ সঙ্গ গ্রহণ না করে বসে। তাকে ব্যস্ত রাখার জন্য হাতে ফোন বা ট্যাবের মতো যন্ত্র ধরিয়ে দেওয়া তার জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। তাই এই প্রবণতা থেকে দূরে থাকা।

ছোট থেকেই বিনয় শেখাতে হবে:

সঙ্গী-সাথিদের সম্মান করা। কথাবার্তায় কোমলতা। ত্যাগেই সম্মান; গ্রহণে নয়। মানুষের জিনিস নেওয়া নিন্দনীয়। অন্যদের দিকে পিঠ দিয়ে না বসা। কারো পায়ের উপর নিজের পা না রাখা। বড়দের প্রশ্নের শুধু জবাব দেওয়া; যতটুকু জিজ্ঞেস করা হয় শুধু ততটুকু বলা। বড়দের কথা মনোযোগসহ শোনা। বড় কেউ এলে তার সম্মানে উঠে জায়গা খালি করে দেওয়া। কুসঙ্গ থেকে দূরে থাকা। মা-বাবা, শিক্ষক, গুরুজন এবং আত্মীয়-অনাত্মীয়, চেনা-অচেনা সব মুরব্বিকে মান্য করা।

শিশুকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা:

শিশু-কিশোরদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য নবী সা. বলেছেন, ‘তোমার সন্তানকে অন্যের উপর নির্ভরশীল করে রেখে যাওয়ার চেয়ে তাদের অপেক্ষাকৃত সচ্ছল রেখে যাওয়া অনেক ভালো।’ (বুখারি: ৬৭৩৩)

তাই বৈধ পন্থায় তার জন্য কিছু সম্পদ রেখে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তাকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। সে শিক্ষিত হলে সারা জীবনই সচ্ছল থাকবে, পরনির্ভরশীল হতে হবে না।

সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া: সন্তানকে সুন্দর আচার-ব্যবহার শিক্ষা দেওয়ার প্রধান দায়িত্ব মা-বাবার উপর। কিন্তু আজকাল অধিকাংশ বাবা-মা অফিস-আদালতের কাজকর্মে এতটাই ব্যস্ত থাকেন যে, সন্তানকে সময়ই দিতে পারেন না। সকালে সন্তানকে ঘুমে রেখে অফিসে যান। আবার বাসায় এসে ঘুমে পান। ছুটির দিন না হলে সাধারণত দেখা-সাক্ষাৎই হয় না। সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব বাসার কাজের বুয়াদের উপর ছেড়ে দেন। ফলে সে সারা দিন যার কাছে থাকছে, তার আচার-আচরণ শিখছে। শিক্ষিত বহুগুণের অধিকারী মা-বাবার অনেক কিছুই শেখা হয় না। সুতরাং মা-বাবার সঙ্গ প্রদানের কোন বিকল্প নেই।

শিশুকে ভালো কাজে উৎসাহ দেওয়া:

শিশুর কোনো সুন্দর আচরণ বা প্রশংসনীয় কাজ চোখে পড়লে, তার প্রশংসা করতে হবে। তাকে খুশি করার মতো কিছু পুরস্কার দিতে হবে।মানুষের সামনে করতে হবে তার প্রশংসা। এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে যখন সে কিছু করবে প্রথমবারের মতো, তখন তা উপেক্ষা করতে হবে। গোপন রাখতে হবে; অন্যের সামনে প্রকাশ করা যাবে না। বিশেষত বাচ্চাটিই যখন চাইবে সেটিকে গোপন রাখতে। অন্যের কাছ থেকে আড়াল করতে। যদি দ্বিতীয়বার এ কাজের পুনরাবৃত্তি করে, তবে তাকে গোপনেই শাসাতে হবে। বলে দিতে হবে, এমন কাজ তুমি দ্বিতীয়বার করা থেকে বিরত থাকবে। অন্যথায় মানুষের সামনে তোমাকে লজ্জা দেয়া হবে। তাকে শাসন করার সময় কখনো অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। এতে করে তার পক্ষে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার শোনা এবং মন্দ বিশেষণ হজম করা সহনীয় হয়ে উঠবে। তার অন্তরে কথার প্রভাব হ্রাস পাবে। তার হৃদয়ে কথার প্রভাব যেকোন মূল্যে বজায় রাখতে হবে।

বাবা-মা’র কোন কিছু নিয়ে তাকে সঙ্গী-সাথী বা বন্ধু-বান্ধবের সামনে বড়াই করতে নিষেধ করবেন। তাকে বরং বিনয়, সাথীদের সম্মান এবং তাদের সঙ্গে কথাবার্তায় কোমলতার স্বভাবে গড়ে তুলবেন। তাকে শেখাবেন- ত্যাগেই সম্মান; গ্রহণে নয়। মানুষের জিনিস নেয়া নিন্দনীয়। তা এমনকি নিচুতা ও হীনতার পরিচায়ক। যদি গরিব ঘরের সন্তান হয়, তবে তাকে শেখাতে হবে পরের জিনিস নেয়া এবং পরের সম্পদে লোভ করা অবমাননা ও লাঞ্ছনাকর।

তাকে অভ্যস্ত করাবেন যাতে সে সবার সামনে থুথু না ফেলে। অন্যদের উপস্থিতিতে হাই না তোলে। অন্যদের দিকে পিঠ দিয়ে না বসে। কারো পায়ের ওপর নিজের পা না রাখে। থুতির নিচে হাতের তালু না রাখে এবং কাঁধে হেলান দিয়ে মাথা না রাখে। কারণ, তা অলসতার আলামত। তাকে আদব শিক্ষা দিবেন। বেশি কথা বলা থেকে বারণ করবেন। এটি যে এক ধরনের বেয়াদবী, তাও তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে। কথা সত্য হোক বা মিথ্যা, তা নিয়ে তাকে মাথা ছুয়ে কসম করতে নিষেধ করবেন। যাতে শৈশব থেকেই তার এ বদ অভ্যাস গড়ে না ওঠে। শিশুকে নিষেধ করতে হবে, বড়দের সামনে কথার

সূচনা না করতে। অভ্যস্ত করতে হবে যে, সে যেন বড়দের প্রশ্নের-ই শুধুমাত্র জবাব দেয়। যতটুকু জিজ্ঞেস করা হয় কেবল ততটুকু-ই বলে। তাঁরা কথা বললে মনোযোগসহ যেন শোনে। বড় কেউ এলে তার সম্মানে উঠে জায়গা খালি করে দেয়। তাদের সামনে যেন না বসে। তাকে বিরত রাখবেন বাজে কথা ও অশ্লীল বাক্যোচ্চারণ থেকে। অন্যকে গালমন্দ করা ও অভিশাপ দেয়া থেকে। যার মুখ থেকে সবসময় গালি উচ্চারিত হয়, তার সঙ্গ ত্যাগ করতে বলবেন। কারণ, খারাপ সঙ্গীদের থেকে তার মাঝে যেন বাদ অভ্যাস ঢুকতে না পারে। বাচ্চাদের শিষ্ট-ভদ্র বানানোর প্রধান উপায়ই হলো তাকে কুসঙ্গ থেকে দূরে রাখা।

সন্তানের জন্য দোয়া

সন্তান মহান আল্লাহর অশেষ নেয়ামত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পৃথিবীতে যত নেয়ামত দান করেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে দামি নেয়ামত সন্তান। সন্তান দুনিয়াতে আসার মাধ্যম হলো বাবা-মা। তাই সন্তানের জন্য বাবা-মায়ের দোয়া সবচেয়ে বেশি জরুরি।

সন্তান দান করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেন, ‘ধন, সম্পদ ও সন্তানসন্ততি পার্থিব জীবনের অলংকার।’ (সুরা: কাহাফ ৪৬)

এই জীবনে যেমন নেক সন্তান চোখের শীতলতা ও সওয়াবের কারণ হয়, মৃত্যুর পরও নেক সন্তানের কারণে মানুষের সওয়াব জারি থাকে। আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

আদম সন্তান যখন মারা যায়, তখন তার তিন প্রকার আমল ছাড়া অন্য সব আমলের ধারা বন্ধ হয়ে যায়; ১. সদকায়ে জারিয়া (ফায়েদা অব্যাহত থাকে এ রকম সদকা যেমন মসজিদ নির্মাণ করা, কূপ খনন করে দেওয়া ইত্যাদি) ২. ইলম বা জ্ঞান যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে থাকে ৩. সুসন্তান যে তার জন্য নেক দোয়া করতে থাকে। (সহিহ মুসলিম: ৪৩১০)

এ কারণে অনেক নবি-রাসুল ও আল্লাহর নেক বান্দারা আল্লাহর কাছে নেক সন্তান প্রার্থনা করেছেন। সন্তানের উত্তম প্রতিপালনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। কোরআনে আল্লাহ তাআলা তার নবিদের নেক সন্তান প্রার্থনা করে করা অনেক দোয়া উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর নেক বান্দাদের বৈশিষ্ট্য হিসেবেও নেক সন্তানের জন্য দোয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে আমরা কোরআনে উল্লিখিত নেক সন্তানের প্রার্থনা সম্বলিত ৩টি দোয়া উল্লেখ করছি।

১. কোরআনে আল্লাহর নেক বান্দাদের অনেক গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সাথে এ দোয়াটি উল্লেখ করে বলা হয়েছে, আল্লাহর নেক বান্দারা এভাবে আল্লাহর কাছে নেক জীবনসঙ্গী ও সন্তানের জন্য প্রার্থনা করে থাকে:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

উচ্চারণ: রাব্বানা হাবলানা মিন আঝওয়াজিনা ওয়া যুররিয়্যাতিনা কুররাতা আইয়ুনিও ওয়াজআলনা লিলমুত্তাক্বিনা ইমামা।

অর্থ: হে আমাদের রব, আপনি আমাদের এমন জীবনসঙ্গী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চোখ শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকিদের জন্য আদর্শ বানান। (সুরা ফুরকান: ৭৪)

২. যৌবনে আল্লাহর নবি হজরত জাকারিয়ার (আ.) সন্তান হয়নি। বৃদ্ধ বয়সে তিনি নেক সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন,

رَبِّ هَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْکَ ذُرِّیَّۃً طَیِّبَۃً ۚ اِنَّکَ سَمِیْعُ الدُّعَآءِ

উচ্চারণ: রাব্বি হাবলি মিল্লাদুনকা যুররিয়াতান ত্বাইয়েবাতান; ইন্নাকা সামিউদ-দুয়া।

অর্থ: হে আমার রব! আমাকে আপনার পক্ষ থেকে উত্তম সন্তান দান করুন, আপনি আপনি দোয়া শ্রবণকারী। (সুরা আলে ইমরান: ৩৮)

৩. আল্লাহর নবি ও খলিল হজরত ইবরাহিম (আ.) নেক সন্তান প্রার্থনা করে দোয়া করেছিলেন,

رَبِّ هَبْ لِیْ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ

উচ্চারণ: রাব্বি হাবলি মিনাস সালিহিন

অর্থ: হে আমার রব, আমাকে সৎকর্মশীল সন্তান দান করুন। (সুরা সাফফাত: ১০০)

সন্তানকে উপযুক্ত সময়ে বিবাহ প্রদানঃ

সন্তানকে যথাযথ প্রতিপালন করা মা-বাবার অপরিহার্য কর্তব্য। সন্তানের জীবনের নিরাপত্তা, শিক্ষা, চিকিৎসা, রোগমুক্ত রাখা স্বাস্থ্যবান হিসেবে গড়ে তোলা এবং জীবনের উন্নতি ও বিকাশকল্পে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালানো মা-বাবার কর্তব্য।

মা-বাবার অন্যতম দায়িত্ব হলো সন্তানকে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নামাজ, রোজা, কোরআন তিলাওয়াত, জিকির-আজকার, তাসবিহ-তাহলিল ইত্যাদি ইবাদতে অভ্যস্ত করা। তাছাড়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, অপরকে সালাম দেওয়া এবং সুন্নত তরিকা মোতাবেক চলার প্রশিক্ষণ দেওয়া।

মহানবী (সা.) বলেছেন, যখন তোমাদের সন্তানের বয়স সাত বছর হয়, তখন নামাজ পড়ার তাগিদ দাও এবং যখন ১০ বছর বয়সে উপনীত হয় তখন নামাজ পড়ার জন্য শাসন করো। আর তখন তাদের বিছানা পৃথক করে দাও। (আবু দাউদ, মিশকাত পৃষ্ঠা-৫৮)।

এছাড়া সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলে তাদের বিয়ে দেওয়ার বিষয়টিতে মা-বাবার গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। কারণ, কোরআন ও হাদিসে এ বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘‘আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস-দাসীদের বিবাহ দাও। তারা অভাবি হলে (চরিত্র রক্ষার জন্য যদি বিয়ে করে তবে) আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী।’ (সুরা নুর : আয়াত ৩২)।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাদিসে বলা হয়েছে, এমন নারী যার স্বামী নেই, চাই সে কুমারী হোক বা বিবাহিত হোক এবং এমন পুরুষ যার স্ত্রী নেই।

উপযুক্ত ছেলে-মেয়ের বিয়ের ক্ষেত্রে দেরি না করার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আলী রা.-কে লক্ষ্য করে বলেন, 'হে আলী! তিনটি জিনিসের ক্ষেত্রে বিলম্ব করবে না। ১. নামাজের যখন সময় আসবে তখন নামাজ আদায় করা থেকে দেরি করবে না। ২. মৃত ব্যক্তির জানাজা যখন উপস্থিত হবে তখন কাফন-দাফন সম্পন্ন করতে দেরি করবে না। ৩. কোন অবিবাহিতা মেয়ের জন্য যখন কোন উপযুক্ত পাত্র পাবে তখন তাকে পাত্রস্থ করা থেকে বিলম্ব করবে না।' -(তিরমিজি ১/২০৬)

আরেক হাদিসে হজরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যার কোনও সন্তান হলো (ছেলে বা মেয়ে) সে যেনো তার সুন্দর নাম রাখে এবং উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়। সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাকে বিয়ে দেবে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সন্তানকে যদি না দেয় এবঙ সে পাপে লিপ্ত হয়, তাহলে বাবা গুনাহগার হবে। (মেশকাত)

পরিশেষঃ

সন্তানকে সঠিক পথে পরিচালিত করা বাবা-মার দায়িত্ব। সন্তান দীন শিক্ষা না দিলে বাবা-মারই ক্ষতি। মৃত্যুর পর তারা কবরেও সন্তানের গুনাহের জন্য শাস্তি পেতে থাকবে। তাই সন্তানকে এমন শিক্ষা দিতে হবে, যেন মৃত্যুর পর তার ভালো কাজগুলোর জন্য মা-বাবাও সওয়াবের ভাগীদার হয়। সেজন্য তাদের উপর সন্তানের কী কী হক ও দায়দায়িত্ব রয়েছে ও সন্তানের সাথে তাদের আচারব্যবহার কেমন হতে হবে।

আর তাদের দীনি তারবিয়াত কীভাবে করতে হবে। মূলত তাদেরকে দীনি তারবিয়াত তথা লালন পালন, আদবকায়দা শিক্ষা দেয়া পিতামাতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। যে মা-বাবা সন্তানের দীনি তারবিয়াতের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করবেন তারা দুনিয়া-আখেরাত উভয়জগতে কামিয়াব হবেন। আর যে মা-বাবা সন্তানের দীনি তারবিয়াত করবেন না তারা পরকালে জবাবদিহির সম্মুখীন হবেন। বাবা-মা ভালো আমলওয়ালা হলেও সন্তানের কারণে পরকালে জাহান্নামে যেতে হতে পারে। আমরা আমাদের সন্তানদেরকে যদি সঠিক

পরিচর্যার আলোকে গড়ে তুলতে পারি , তাহলে তারা আদর্শ সন্তান হিসেবে গড়ে উঠবে এবং আমাদের নাজাতের ওসীলা হবে। সন্তানও জাহান্নাম থেকে বাচবে আমরাও পরকালে নাজাত পাবো।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমিন